# মাজহাব বনাম আহলে হাদীস

[কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জনের সঠিক পন্থা]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

# লেখকের কথা

বর্তমান সময়টি বাক স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার ব্যাপক প্রচার প্রসারের যুগ। যে যা বোঝে ও জানে সেটাকে চুড়ান্ত বা কমপক্ষে যথেষ্ট মনে করার প্রবণতা প্রায় সকলকে পেয়ে বসেছে। আধুনা ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি বিরাট অংশ এখন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার বক্তা বা পত্র পত্রিকার কলাম লেখক থেকে শুরু করে মাঠে ময়দানে যারা ওয়াজ-নাসীহত করে থাকেন তাদের সকলেই যে যার মতো ইসলামের ব্যখ্যা করে চলেছেন। কোরআনের কোনো আয়াত বা আল্লাহর রসুলের কোনো হাদীসকে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ব্যখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম বা পূর্ববর্তী আস্থাশীল ওলামায়ে কিরামের মতামতকে উল্লেখ করা হয় না বা কমপক্ষে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জিহাদ, রাষ্ট্র, উত্তরাধিকার, তালাক, বিবাহ ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে যারা বই লিখছেন বা আলোচনা করছেন তারা নিজেদের গবেষক বা চিন্তাবিদ মনে করলেও মূলত তারা খুব কমই চিন্তা-গবেষণা করে থাকেন। নিজেদের উপর এদের আস্থা এতটাই বেশি যে, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ শ্রতা-দর্শকের সামনে কোনো বিষয়ে কথা বলার জন্য কয়েকটি আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া বা বেশি হলে দু'একজন সমসাময়িক গবেষকের লেখায় চোখ বুলিয়ে নেওয়াই এরা যথেষ্ট মনে করে থাকেন। পূর্ববর্তী

নেককার ওলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মতামতের ব্যাপারে এই সকল গবেষকরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা গবেষণা নিজেদের মতের বিরুদ্ধে গেলে এরা সকল ওলামায়ে কিরামের মতামত শুধু দূরে নিক্ষেপ করেন তাই নয় বরং কখনও কখনও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের তিরষ্কারও করে থাকেন। সাধারনত আহলে হাদীস বা সালাফীরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধরণের আকীদা বিশ্বাসের ঘোষনা দিয়ে থাকে। তারা মাযহাব ও ফুকাহায়ে কিরামের মতামতকে অভিসাপ মনে করে, যারা মাযহাবের অনুসরণ করে তাদের মুকাল্লিদ বা অন্ধ অনুসারী বলে তিরষ্কার করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যারা মুখে নিজেদের মাযহাবী বলে পরিচয় দেয় তারা মুক্ত চিন্া বা বাকস্বাধীনতার দাবীদারদের প্রচার প্রসারের বিরোধীতায় শক্তভাবে অবস্থান নেওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ফতওয়া প্রদান বা দ্বীনী আলোচনাতে তারাও পূর্বোক্ত ব্যাক্তিদের পন্থা পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকেন। এই ধরণের নীতির ফলাফল হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামের নামে এখন এমনসব চিন্া-দর্শন প্রচার করা হচ্ছে যেগুলো নিন্দনীয় বিদয়াত তো বটেই এমনটি ক্ষেত্র বিশেষে শিরক বা কুফর। বক্ষমান গ্রন্থে আমরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং কোনো মাসয়ালাতে আল্লাহ (ﷻ) বা তার রসুল (ﷺ) এর রায় বর্ণনার সময় কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ সেটা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো ইন শাআল্লাহ। কোরআন-হাদীস

বোঝার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ সেটা প্রমাণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই। তিনিই উত্তম আশ্রয়স্থল।

*আব্দুল্লাহ আল মুনীর*
***abdullah_almunir@yahoo.com***

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم علي رسوله الكريم أما بعد .....

## [#] জ্ঞানের মর্যাদাঃ

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]

﴿ হে নবী আপনি বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? ﴾ [সূরা ঝুমার:৯]

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]

﴿ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আল্লাহ (ﷻ) মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। ﴾ [সূরা মুজাদালাহ: ১১]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

﴾ একজন নেককার ব্যাক্তির উপর একজন আলেমের সম্মান এতো বেশি যেমন তোমাদের মধ্যে আমার সম্মান। ﴿

[তিরমিযী:আলবানী সহীহ বলেছেন]

অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

﴾ আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ্ ﴿

[তিরমিযী আলবানী সহীহ বলেছেন]

ইমাম বুখারী (رحمه الله) বলেন,

العلم قبل القول والعمل

﴾ কোনো কথা বলা বা কোনো কাজ করার পূর্বে (উক্ত বিষয়ে) জ্ঞান অর্জন জরুরী। ﴿ [সহীহ বুখারী]

## [#] কোরআন হাদীস হতে ইল্‌ম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি:

কোরান হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করে আমল করার

ব্যাপারে মানুষ দুই দলে বিভক্ত।

**[১]** কিছু লোক সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী উলামায়ে মুজতাহিদীনের মতামতকে উপেক্ষা করে সরাসরি কোরান হাদীসের উপর আমল করতে চান। পূর্ববর্তী আলেমরা এদের জাহেরী (الظاهرية) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে হিযাম ও দাউদ আজ-জাহিরী। তবে বর্তমানে জাহেরীদের আদর্শ ও চিন্তাভাবনাতে যে মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে ইবনে হিযাম বা দাউদ আজ-জাহিরী তা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তারা ইজমাকে দলীল হিসাবে মান্য করতেন। উলামায়ে কিরামের মতামতকে কমবেশি শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। একারণে আলেমরা কেউই তাদের পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত মনে করেননি। কিন্তু বর্তমানে কিছু লোক ইজমা অস্বীকার করে, ফিকাহগ্রন্থ ও ওলামায়ে কিরামের মতামতকে পিছনে নিক্ষেপ করে। তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলে যে কাউকে বিদআতী, গোমরাহ্, কাফির ইত্যাদি ফতওয়া দিয়ে বসে। এরা সব সময় নিজেদের সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী মনে করে খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে সারক্ষণ তর্ক বিতর্কে লিপ্ত

থেকে সময় নষ্ট করে। এরা নিজেদের আহলে হাদীস, সালাফী ইত্যাদি নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবাই সমান নয় তবে বেশিরভাগের অবস্থা তা যা আমরা বর্ণনা করলাম। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

[২] যারা কোরান হাদীস বোঝার ব্যাপারে সাহবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষপাতী। দ্বিতীয় দলটির বৈশিষ্ট হলো ইজমাকে অকাট্য দলীল মনে করা, বেশিরভাগ আলেমের মতামতকে উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত বিরল মতকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা, কোরান বা হাদীসের কোনো দলীল হতে আমরা এখন যা বুঝি সেটাকে চুড়ান্ত মনে না করে ঐ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামদের বুঝ কি ছিল সেটা লক্ষ করা এবং নিজেদের বুঝ পরিত্যাগ করে তাদের বুঝ গ্রহণ করা ইত্যাদি। এটা চার মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারীদের চিন্তাধারা।

আহলে হাদীস বা সালাফীরা অবশ্য এই সকল আলেমদের মাযহাবী আলেম বলে তিরস্কার করে

থাকেন এবং এদের অনুসারীদের মুকাল্লিদ, অন্ধ অনুসারী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে গালিগালাজ করে থাকেন। একইভাবে মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কিরাম প্রথম যুগ হতেই প্রথম দলটিকে জাহেরী নামে আখ্যায়িত করে আসছেন। সাদামাটাভাবে কোরআন-হাদীস বোঝার চেষ্টা করার কারণে তারা তাদের নিন্দাও করেছেন। কাজী ইবনুল আরাবী (ﷺ) ওযুতে মাথা মাসেহ করার পরিবর্তে ধৌত করে নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করার পর এটার নিন্দা করে বলেন,

وَهَذَا تَوَجُّهٌ فِي مَذْهَبِ الدَّاوُدِيَّةِ الْفَاسِدِ مِنْ اتِّبَاعِ الظَّاهِرِ الْمُبْطِلِ لِلشَّرِيعَةِ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

এটা হচ্ছে দাউদের [দাউদ আজ-জাহেরী যার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি] ভ্রান্ত নীতিমালাসমূহের মধ্যে একটি। আর তা হলো [শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনের চেষ্টা না করে] কেবল বহ্যিক দৃষ্টিতে যা প্রকাশিত হয় তার অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়তকে

ধ্বংস করে দেওয়া । স্বয়ং আল্লাহ (ﷻ) এর নিন্দা করে বলেন ‘‘তারা তো কেবল দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে অবগত’’ [সূরা রুম/৭]।

[আহকামুল কুরআন]

এ ব্যাপারে এই উভয় দলের মধ্যে দ্বিতীয় দলটিই সত্যপন্থী কেননা সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মতামত উপেক্ষা করে সরাসরি কোরআন হাদীস হতে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করলে মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করবো।

## [#] সরাসরি কোরআন হাদীস বুঝতে গেলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে।

প্রথমেই আমরা কোরআন থেকে এরুপ পাঁচটি উদাহরণ পেশ করবো,

**[১]** আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

﴿ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ﴾ [সূরা নিসা/৯৩]

এই আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হচ্ছে, যে কেউ কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ বিষয়ের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে যদি কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করে তবে হত্যার কারণে সে চিরকাল জাহান্নামী হবে না। কেবলমাত্র খারেজীরা কেউ কোনো মুমিনকে বিনা কারণে হত্যা করলে বা অন্য কোনো কবীরা গোনা করলে তাকে কাফির বলে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে বলে মনে করে। তারা এই আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থ হতে দলীল পেশ করে।

[২] জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

﴿ আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। তোমার রবের পক্ষ হতে এটা নিরবিচ্ছিন্ন দান। ﴾

[সূরা হুদ/১০৮]

এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে অনেকের ধারণা হবে যারা জান্নাতী হবে তাদের একদিন জান্নাত হতে বের করে দেওয়া হবে কেননা এখানে বলা হচ্ছে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী টিকে থাকে পরে আবার বলা হচ্ছে আপনার প্রভূ যদি ভিন্ন কিছু চান তবে সেটা সতন্ত্র। বর্তমান মুসলিম চিন্তাবিদদের কেউ কেউ এমন বিভ্রান্তিকর কথা বলতে শুরু করেছেন কিন্তু উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে জান্নাতে একবার যে প্রবেশ করবে তাকে কখনও সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে না। জান্নাতের জীবন কখনও শেষ হবে না।

**[৩]** উহুদ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর সাহাবায়ে

কিরাম (ﷺ) যখন হতদম্য হয়ে পড়লেন তখন তাদের শান্না দিয়ে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ

﴿ আর এ দিনগুলোকে (যুদ্ধের দিনগুলোকে) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। (অর্থাৎ একেক বার একেক দল বিজয়ী হয়)। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। ﴾

[আলে ইমরান/১৪০]

এভাবে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ﴾ [المائدة: ٩٤]

﴿ যেনো আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাকে ভয় করে। ﴾

[সূরা মায়েদা/৯৪]

﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ﴾ [الحديد: ٢٥]

«যেনো আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাকে ও তার রসুলকে সাহায্য করে।»

[সূরা হাদীদ/১২৫]

এই সকল আয়াত থেকে একদল লোক মনে করেছিল যা কিছু ঘটে তা ঘটার পরই আল্লাহ জানতে পারেন তার আগে নয় [নাউযু বিল্লাহ]। সাহাবাদের যুগেই এই দলটির আবির্ভাব ঘটে তাদের বলা হতো কদরিয়্যা (القدرية)। তারা বলতো,

لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ

«পূর্ব হতে কিছুই লেখা নেই যা ঘটছে হঠাৎই ঘটছে।»

[সহীহু মুসলিম]

আয়াতগুলোর প্রকাশ্য অর্থ থেকে এমনটিই মনে হয় কিন্তু মুফাস্সিরগণ এর অর্থে বলেছেন (ليعلم الله) "যেনো আল্লাহ জেনে নেন" এর অর্থ (ليعلم المؤمنون)

“যেনো মমিনরা জেনে নেয় বা বুঝতে পারে”। কোনোরুপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই সরাসরি আয়াগুলোর উপর আমল করলে কাদরিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা সত্য প্রমাণিত হয়।

[৪] আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

[النساء: ٤٨]

﴿নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।﴾ [সূরা নিসা/৪৮]

এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী কেউ কেউ মনে করতে পারে আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ ক্ষমা করবেন তাহলে তিনি কুফরীর পাপ ক্ষমা করবেন। এ হিসাবে কাদিয়ানীরা বা অন্যান্য কাফিররা কিয়ামতের দিন ক্ষমা পেতে পারে। বর্তমানে কেউ কেউ এমন বলতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য যে, সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে এ ধরণের কথা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

[৫] আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]

﴿তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে তুমি বলো আল্লাহ তোমাদের কালালা সম্পর্কে সঠিক বিধান বলে দেবেন যদি কোনো ব্যাক্তি মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে তবে তার বোন পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক।﴾

[সূরা নিসা/১৭৬]

যে কোনো পাঠক কোরআনের এই আয়াতটি পড়ে মনে করবেন, যে মারা যায় যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার একজন বোন থাকে তবে তার বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আর যে কেউই থাক বা না থাক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এখানে সন্তানের সাথে পিতা না থাকা শর্ত করেছেন। কেবল মাত্র শিয়ারা বলেছে পিতা জীবিত থাকলেও বোনকে অংশ দিতে হবে। তারা দলীল হিসাবে এই

আয়াত পেশ করেছে। কোনোরুপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া এই আয়াতটির উপর সরসরি আমল করলে শীয়াদের মতই সঠিক বলে মনে হয়। আর সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী ওলামাদের দ্বীনের মত কোরানের বিপরীত মনে হয়।

এমন আরো অনেক আয়াত পেশ করা যায় কিন্তু স্থান সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এবং বুদ্ধিমানের জন্য অল্প কথা যথেষ্ট হবে মনে করে আমরা তা হতে বিরত হচ্ছি।

এখন আামরা এ বিষয়ে হাদীস হতে পাঁচটি উদাহরণ পেশ করবো।

**[১]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

﴿ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার ভায়ের সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হয় তখন তার চেহারার উপর যেনো আঘাত না করে কেননা আল্লাহ (ﷻ) আদমকে তার নিজ রুপে সৃষ্টি করেছেন। ﴾ [সহীহ মুসলিম]

হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ হতে অনেকে মনে করবেন আল্লাহর চেহারা মানুষের চেহারার মতো [নাউযু বিল্লাহ]। এটা মুজাসসিমাদের আকীদা। যারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে তাদের মুজাসসিমা বলা হয়। এটি একটি ভ্রান্ত আকীদা। এটা কুফরী পর্যন্ত পৌছায়। ইমাম নাব্বী এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,

فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُ حُكْمِهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهَا وَيَقُولُ نُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ وَأَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ وَلَهَا مَعْنًى يَلِيقُ بِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَهُوَ أَحْوَطُ وَأَسْلَمُ وَالثَّانِي أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ ليس كمثله شئ

হাদীসটি সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। ..... আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ এসব হাদীসের কোনোরুপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে দূরে থেকেছেন। তারা বলেন আমরা বিশ্বাস করি যে এগুলো সত্য এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং এর এমন কোনো অর্থ রয়েছে যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের মধ্যে অধিকাংশ আলেম এই কথাই বলেছেন। আর এটাই বেশি নিরাপদ। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য আল্লাহ (ﷻ) এর মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে এবং সৃষ্টির সাথে তাকে তুলনা না করে এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। [শারহে মুসলিম]

এরপর তিনি আলেমদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন এখানে চেহারা বলতে আদমের চেহারা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আদম (عليه السلام) কে আদম (عليه السلام) এর নিজ চেহারাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইমাম নাব্বী বলেছেন এটা দূর্বল। কেউ বলেছেন চেহারা বলতে যাকে প্রহার করা হচ্ছে তার চেহারা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাকে প্রহার করা হচ্ছে তার চেহারা আদম (عليه السلام) এর চেহারার মতই সুতরাং আদম (عليه السلام) এর সম্মানে তার চেহারায় আঘাত না করতে বলা হচ্ছে। কেউ বলেছেন চেহারা এখানে আল্লাহর দিকেই সম্পর্কিত করা হয়েছে কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ করা যেমন কা'বাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর বলা হয়।

এক কথায়, ব্যাখ্যা যায় হোক হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী কখনই একথা বলা যাবে না যে আল্লাহর (ﷻ) আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। [নাউযু বিল্লাহ]

[২] রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا

«বানু ইসরাঈলে তিনজন লোক ছিলো যাদের একজন ছিলো ধবল রোগী, অন্যজন টাক শেষের জন ছিলো অন্ধ। আল্লাহর অন্তরে উদয় হলো যে তিনি তাদের পরীক্ষা করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন ফেরেস্তাকে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন।»

[সহীহ বুখারী]

হাদীসে (بدا لله) বা আল্লাহর অন্তরে উদয় হলো এই অংশটুকুতে বিশেষভাবে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা আল্লাহ (ﷻ) সব কিছু পূর্ব হতেই জ্ঞাত

আছেন। সমস্ত সিদ্ধান্ত অনাদি অনন্ত সময় হতে তার জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। নতুনভাবে তিনি কোনো কিছুই চিন্তা করেন না তার অন্তরে নতুন কিছুই উদয় হয় না। যদি কেউ হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে আল্লাহ (ﷻ) নতুনভাবে চিন্তা-গবেষণা করেন এমন দাবী করে তবে এটা কুফরী আকীদা-বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। সুতরাং হয়তো হাদীসটির ব্যাখ্যা করা হতে দূরে থাকতে হবে নতুবা এমন কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে যা আল্লাহ (ﷻ) এর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

**[৩]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

«দুই মানুষের মধ্যে দুটি কুফরী রয়েছে, বংশ তুলে গালী দেওয়া আর মৃতের জন্য বিলাপ করা» [সহীহ মুসলিম]

এখানে বংশ তুলে গালি দেওয়া বা মৃতের জন্য বিলাপ করাকে কুফরী বলা হয়েছে অথচ কোনো মুসলিম এসব

কাজ করলে কাফির হয়ে যায় না। এরকম আরো অনেক হাদীসে অনেক কাজকে কুফরী বলা হয়েছে কিন্তু সেগুলো প্রকৃত অর্থে কুফরী নয় সুেগুলোতে লিপ্ত হলে কেউ কাফির হয়ে যায় না বা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ

﴾ যে দাস তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে যায় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত কুফরীতে লিপ্ত থাকে। ﴿ [সহীহ মুসলিম]

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ

﴾ যে কেউ জেনে বুঝে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেয় সে কাফির হয়ে যায় ﴿

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এই ধরণের আরো অনেক হাদীসে এমন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। খারেজীরা হাদীসগুলোকে নিজেদের মতের স্বপক্ষে ব্যাবহার করেছে। তাদের মত

ছিলো যে কোনো কবীরা গোনা করলে একজন মুসলিম কাফির হয়ে যায়। কিন্তু উম্মতের ওলামায়ে কিরাম হাদীসুগলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে সরাসরি হাদীসগুলোর বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করলে ভীষণ বিপর্যয় দেখা দেবে।

**[৪]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

«যে কেউ জেনে শুনে তার পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেয় তার জন্য জান্নাত হারাম।»

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এই হাদীসটি আগের হাদীসগুলোর মতই কিন্তু এখানে একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে তার জন্য জান্নাত হারাম। উম্মতের আলেমদের ইজমা যে এই হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং অতিরিক্ত ভয় প্রদর্শনের জন্য এভাবে বলা হয়েছে। আলেমদের পরিভাষায় এটাকে তাগলীজ [التغليظ] বলা

হয় যার অর্থ ‘‘অতিরিক্ত কঠোরতা’’।

**[৫]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

❖ যে কেউ পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে তাকে জাহান্নামের আগুনে রাখা হবে সেখানে পাহাড় থেকে ঝাপিড়ে পড়তে থাকবে। চিরদিন, স্থায়ীভাবে সর্ব সময়ের জন্য সে এমন করতে থাকবে। যে কেউ বিষ পান করার মাধ্যমে নিজেকে হত্যা করে সেই বিষ তার হাতেই থাকবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে চিরদিন, চিরস্থায়ীভাবে সর্ব সময়ের জন্য সে ঐ বিষ পান করতে থাকবে। যে লৌহ খণ্ড দ্বারা নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করে, উক্ত লৌহ খণ্ডটি তার হাতেই থাকবে। জাহান্নামের আগুনের মধ্যে চিরকাল, চিরস্থায়ী ভাবে অনন্ত সময় পর্যন্ত সে ওটা দ্বারা

নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এই হাদীসটিতে খুবই স্পষ্টভাষায় দ্ব্যার্থহীনভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, আত্মহত্যাকারী চিরকাল, চিরস্থায়ীভবে অনন্ত সময় পর্যন্ত জাহান্নামের ভিতর নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। কিন্তু আলেমদের ইজামা যে আত্মহত্যাকারী কাফির নয় এবং সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না।

আকীদা ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে সেগুলোর বহ্যিক অর্থের উপর আমল করলে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হতে হবে। এ কারণে জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হলো, কোরান হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে আস্থাভাজন ওলামায়ে কিরামের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী চলা।

## [#] কোরআন হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতিতে পতিত হওয়ার কারণ সমূহ। ।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে কোরআন বা হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে এধরণের সমস্য সৃষ্টি হচ্ছে কেনো? তাদের প্রশ্নের উত্তর হলো কোরআন বা হাদীস আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ভাষা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাষাভাষী লোক ভিন ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যে ব্যাক্তি ভাষার ব্যাবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞ সে কখনই সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবনে সক্ষম হবে না। তাছাড়া আল্লাহ (ﷻ) ও তার রসুল (ﷺ) বিভিন্ন হুকুম আহকাম বা বিধিবিধান প্রনয়ণ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মনীতির আলোকে তা করেছেন কখনও কখনও পূর্বের বিধান বাতিল করে নতুন বিধান প্রনয়ণ করেছেন। কখনও কখনও কোনো শব্দ যে অর্থে ব্যাবহৃত হয় সে অর্থে ব্যাবহার না করে ভিন্ন অর্থে ব্যাবহার করেছেন। সেগুলোকে শরয়ী পরিভাষা বলা হয়। এসব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও কোরান হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা বা সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। "উসুলে ফিকহ্" এর গ্রন্থসমূহতে এই সব নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা নিচে এইসব

বিষয়াবলীর মধ্য হতে প্রধান পাঁচটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইন-শাআল্লাহ।

**[১] শব্দের অর্থ নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা।**

কোনো শব্দের অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা হতে পারে,

**[ক] অপ্রচলিত ও অপ্রসিদ্ধ শব্দসমূহ।**

প্রতিটি ভাষায় এমন কিছু শব্দ থাকে যেগুলোর ব্যবহার ও প্রচলন কম থাকে সে কারণে অধিকাংশ লোক সেসব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। আরবীতে এই ধরণের শব্দকে গরীব (غريب) বলা হয়। যার অর্থ অপ্রচলিত বা অপ্রসিদ্ধ শব্দ। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন,

كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى آتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أنا ابتدأتها

❖ আমি জানতাম না "ফাতিরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি" [সূরা ফাতির/১] এর অর্থ কি পরে দুজন বেদুইন আমার নিকট আসলো তারা পরষ্পরের সাথে একটি কুপ নিয়ে বাক বিতণ্ডা  করছিল তাদের মধ্যে

একজন বললো (انا فطرتها) আমি ওটা সৃষ্টি করেছি, আমি ওটা প্রথম তৈরী করেছি।

[বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান, তাফসীরে তাবারী]

অর্থাৎ বেদুইনের মুখে ফাতির শব্দটি শোনার পূর্বে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর অর্থ জানতেন না। উমর (رضي الله عنه) একবার মজলিসের মধ্যে সূরা নাহলের ৪৭ নং আয়াতে ব্যবাহৃত তাখওয়ুফ (تخوف) শব্দটির অর্থ জানতে চাইলে হুজাইল গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন,

هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص.فخرج رجل فقال: يا فلان، ما فعل دينك ؟ قال: تخوفته، أي تنقصته،

হে আমীরুল মুমিনীন ওটা আমাদের ভাষা। আমাদের মধ্য হতে কোনো একজন ব্যাক্তি অন্য জনকে বলে তোমার দ্বীন-ঈমানের কি অবস্থা? উক্ত ব্যাক্তি বলে তাখওয়াফতুহু (تخوفته) এর মাধ্যমে তারা উদ্দেশ্য করে তানাক্কাসতুহু (تنقصته) অর্থাৎ আমি আমার দ্বীন-ঈমানের মধ্যে কমতি অনুভব করছি।

উমর (رضي الله عنه) বললেন,

أتعرف العرب ذلك في أشعارهم ؟

﴿ আরবদের কবিতার মধ্যে কি এ শব্দটি এই অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে? ﴾

উক্ত ব্যাক্তি হ্যা সূচক উত্তর দিয়ে একটি কবিতা পাঠ করে শোনালে উমর (رضي الله عنه) খুশি হয়ে বলেন,

يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم

﴿ ওহে মানব সকল তোমাদের উচিৎ জাহেলী যুগের কবিতাসমূহ মুখস্থ করা কেননা তাতে তোমাদের কিতাবের তাফসীর এবং তোমাদের ভাষার অর্থ লুকিয়ে রয়েছে।﴾

[তাফসীরুল কুরতুবী]

দেখা যাচ্ছে উমর ও ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর মতো সাহবাদের কোনো কোনো আরবী শব্দের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের আরব বেদুইন ও জাহিলী যুগের কাবিদের কবিতার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যে কোনো গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ খুললেই দেখা যাবে

কোরানের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় তৎসময়ের কবিদের কবিতাকে শাহিদ (দলীল) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে অপ্রচলিত ও অপ্রসিদ্ধ শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

এই সকল শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে যেয়ে আলেমদের মাঝে কখনও কখনও দ্বিমত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (رحمه الله) বলেন,

السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " ; فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته

আলেমদের মাঝে মতপার্থক্যের ষষ্ঠ কারণটি হলো

কখনও কখনও হাদীসে ব্যাবহৃত শব্দটি গরীব (অপ্রচলিত) হওয়ার কারণে হাদীসটির অর্থ বুঝতে না পারা। যেমন মুযাবানা (المزابنة), মুহাকালা (المحاقلة), মুখাবারা (المخابرة), মুলামাসা (الملامسة), মুনাবাযা (المنابذة), গরার (الغرر) এবং এছাড়া অন্যান্য শব্দ যেসবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। এর উদাহরণ হিসাবে আরেকটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে যেখানে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) "ইগলাকের মাধ্যমে তালাক ও দাস মুক্তি হয় না" [ইবনে মাযা, আলবানী হাসান বলেছেন]। আলেমরা বলেছেন ইগ্লাক (اغلاق) অর্থ ইকরাহ (اكراه) বা জবরদস্তি করা। যিনি এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন হতে পারে তিনি এই ব্যাখ্যা জানেন না। কখনও কখনও এমনও হয় যে উক্ত আলেম যে অঞ্চলের লোক সেই আঞ্চলের ভাষায় শব্দটির যে অর্থ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর অঞ্চলে শব্দটির অর্থ তা নয় কিন্তু তিনি শব্দটিকে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

[রফউল মালাম]

চিন্তাশীল ব্যাক্তিদের জন্য ইবনে তাইমিয়া (رحمه الله) এর এই বিশ্লেষণটির মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

**[খ] দ্বৈত অর্থবোধক শব্দসমূহ।**

অন্যান্য ভাষার মতো আরবী ভাষাতেও এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা একাধিক অর্থে ব্যাবহৃত হয়। বাংলাতে যেমন তীর শব্দটি একই সাথে নদীর তীর ও ধনুকের তীর অর্থে ব্যাবহৃত হয়। এধরণের শব্দকে উসুলের পরিভাষায় মুশতারাক (مشترك) বলা হয়। যার অর্থ দৈত অর্থবোধক শব্দ। মুশতারাক শব্দ কোরআনের কোনো আয়াতে বা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো হাদীসে ব্যাবহৃত হলে শব্দটির কোন অর্থ উদ্দেশ্য সে বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে। যেমন আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

«তালাক প্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরু (قروء) অপেক্ষা করবে।»

[সূরা বাকারা/২২৮]

আয়াতের কুরু (قروء) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

প্রথমতঃ হায়েজকে কুরু বলা হয় দ্বিতীয়তঃ দুই হায়েজের মাঝে যে সময়টুকুতে একজন মহিলা সলাত ও সওম পালন করতে পারে সেই পবিত্র সময়কে কুরু বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন আর ইমাম শাফেঈ ও অন্যন্যরা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে কুরু শব্দটির একাধিক অর্থ থাকার কারণে তাদের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]

﴿তোমাদের পিতারা যেসকল নারীদের সাথে নিকাহ্ করেছে তোমরা তাদের সাথে নিকাহ্ করো না।﴾ [সূরা নিসা/২২]

নিকাহ্ (نكاح) শব্দটি একদিকে যেমন বিবাহ অর্থে ব্যাবহৃত হয় অপরদিকে বিবাহ পরবর্তী বা বিবাহ ছাড়াই কোনো নারীর সাথে মিলিত হওয়াকেও নিকাহ্ বলা হয়। এই আয়াতে দুটি অর্থের কোনটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ মনে করেছেন এখানে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য

তাই পিতা যে মেয়ের সাথে জিনা করে তার সাথে পুত্রের বিবাহ করা তিনি হারাম মনে করেন নি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য সে কারণে যে কোনো ভাবে কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের সাথে সহবাস করলে তার পুত্রের জন্য উক্ত মেয়ের সাথে বিবাহ করা হারাম হবে বলে মত দিয়েছেন।

ওযুর আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]

﴿এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো।﴾

[মায়েদা/৬]

ওযুর সময় মাথার সম্পূর্ণ অংশ মাসেহ করতে হবে নাকি কিছু অংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট হবে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। মতপার্থক্যের কারণ এই আয়াতে "রুউসাকুম" (برءوسكم) এর পরিবর্তে "বিরুউসিকুম" (برءوسكم) বলা হয়েছে। আরবীতে বি (بِ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

এই আয়াতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছেন। হয়তো এটা মিন (من) অর্থ বোঝাবো সে সে ক্ষেত্রে কিছু অংশ মাসেহ করা ফরজ হবে অথবা এটা অতিরিক্ত গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হবে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ হবে। ইমাম মালেক দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানীফা প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে একটি শব্দের দৈত্ব অর্থের কারণে এই বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে।

হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ

শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে।

[সহীহ মুসলিম]

শাফাক (شفق) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরপরই যে লাল আভা দেখা যায়

সেটাকে শাফাক বলে। আবার উক্ত লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার পর সে সাদা আলো বিদ্যমান থাকে সেটাকেও শাফাক বলে। হাদীসে মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করার সময় কোন শাফাকের কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এখানে সাদা শাফাক উদ্দেশ্য অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের মতে এখানে লাল শাফাক উদ্দেশ্য।

এধরণের আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

**[গ] শরায়তের নিজস্ব পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ।**

অনেক সময় কোনো একটি শব্দকে তার শাব্দিক অর্থে ব্যাবহার না করে শরয়ী অর্থতে ব্যাবহার করা হয়। এইসকল শব্দকে মুজমাল (مجمل) বলা হয়। অভিধান ঘাটাঘাটি করে মুজমাল শব্দের অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বরং তার অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের দলীল প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন সলাত, যাকাত, হাজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি শব্দকে ইসলাম নিজ পরিভাষা হিসাবে ব্যাবহার করেছে। এগুলোর সঠিক অর্থ শুধুমাত্র আরবী অভিধান ও ভাষা বিশ্লেষণের

মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং শরীয়তের দলীল প্রমাণের মাধ্যমেই এগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে হবে। কখনও কখনও কোনো মুজমাল শব্দের শরয়ী অর্থ নির্ণয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়। সফরে সলাত কসর করতে হয় কিন্তু কতদূর সফর করলে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে কসর করার সুযোগ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। একইভাবে জুময়ার দিন যে খুতবা দেওয়া হয় কিভাবে খুতবা দিলে সেটা শরীয়তের পরিভাষায় খুতবা বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) মোজার উপর মাসেহ করার জন্য পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত করেছেন। এই হাদীসে পবিত্রতা বলতে ওযু থাকা অবস্থায় পরিধান করার কথা বলা হচ্ছে নাকি নাপাক বস্তু হতে পবিত্রতার কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়ে সামান্য দ্বিমত আছে। যদিও জমহুর আলেমের মতে এখানে ওযুকেই বোঝানো হচ্ছে।

**[ঘ] ব্যাকরনিক নিয়মাবলী।**

শব্দের অর্থ নির্ণয়ে ক্ষেত্রে আরবী ব্যাকারণের নিয়মকানুনের উপরও বহু বিষয় নির্ভর করে। সূরা

মায়েদার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) সলাত পড়ার পূর্বে ওযু করার আদেশ দিয়েছেন। সেখানে (وارجلكم) শব্দটির দুটি কিরাত রয়েছে। কেউ পড়েছেন যবর দিয়ে কেউ পড়েছেন জের দিয়ে। দুটি কিরাতের কারণে আয়াতটির দুরকম অর্থ হয়। যবর দিয়ে পড়লে পা ধৌত করতে হবে এমন অর্থ হয় আর যের দিয়ে পড়লে পা মাসেহ করতে হবে এমন অর্থ হয়। একারণে এ বিষয়ে সামান্য দ্বিমত আছে। তবে জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে পা ধৌত করতে হবে। এভাবে নাহু (النحو), সরফ (صرف), বালাগাত (بلاغة) ইত্যাদি নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করে অনেক সময় মতপার্থক্য হয়। আরবী ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলিতে যথেষ্ট সুক্ষতা রয়েছে এমনকি আরবী ভাষাভাষীদের বেশিরভাগই ব্যাকারনিক নিয়মকানুনের উপর দক্ষ নয়। ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন,

আব্দুল আজীজ নামক একজন খলীফার নিকট এক ব্যাক্তি তার জামাতা সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি বলেন,

مَنْ خَتَنَكَ؟

﴾ তোমার খাতনা করিয়েছে কে? ﴿

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শুনে অভিযোগকারীর চোখ কপালে উঠে যায়। অবাক হয়ে বলে,

ختني الخاتن الذي يختن الناس

﴾ আমার খাতনা সেই ব্যাক্তি করিয়েছে যে অন্য সব মানুষের খাতনা করায়। ﴿

উত্তর শুনে খলীফাও অবাক হন। তিনি আসলে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে চান নি। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন "তোমার জামাতা কে?" কিন্তু সেটা করতে হলে তাকে (خَتَنُكَ) "খাতানুকা" বলতে হতো কিন্তু তিনি বলেছেন (خَتَنَكَ) "খাতানাকা"। এই ছোট ভুলটির কারণে এতোবড় বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে।

এর পর তিনি এক সপ্তাহ্ ঘর হতে বাইরে বের হন নি। বাড়িতে অবস্থান করে আরবী ব্যকারণ শিক্ষা করছিলেন। এক সপ্তাহ্ পর যখন বাইরে বের হলেন দেখা গেলা তিনি সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন। এর পর যে কেউ শুদ্ধ আরবীতে

কথা বলতো তিনি তাকে অধিক ভাতা প্রদান করতেন আর যে ভুল করতো তার ভাতা কমিয়ে দিতেন। এই ঘটনার পর একজন ব্যক্তি তার নিকট গমণ করলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন

ممن أنت؟

তুমি কোন বংশের লোক?

উক্ত ব্যক্তি বলে,

من بنو عبد الدار

আব্দুদ দার গোত্রের।

এই ব্যক্তির বলা উচিৎ ছিল (من بني عبد الدار) ''মিন বানী আব্দিদ দার'' কিন্তু সে বললো (من بنو عبد الدار) ''মিন বানু আব্দিদ দার''।

এই ভুলের কারণে খলীফা তার ভাতা এক'শ দীনার কমিয়ে দেন।

[আল-বিদাইয়া ওয়ান-নিহাইয়া]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيٓءٌ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ﴾ [التوبة: ٣]

«আল্লাহ মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার রসুলও।» [সূরা তাওবা/৩]

একজন কারী এই আয়াতটির রসুল শব্দের লামের উপর জের দিয়ে পড়ছিলো। এর ফলে আয়াতটির অর্থ দাড়াচ্ছিল "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার রসূল থেকেও [নাউযু বিল্লাহ]। একজন আরব বেদুইন এই তিলাওয়াত শুনে বলল,

إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء

«যদি আল্লাহ তার রসুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন তবে আমিও তার থেকে বিচ্ছিন্ন।»

ঐ ব্যক্তির এই কথা শুনে উক্ত তেওয়াতকারী তার চাদর পেচিয়ে ধরে তাকে উমর (رضي الله عنه) এর নিকট হাজির করলো। উক্ত ব্যক্তি তাকে সব খুলে বললো। উমর (رضي الله عنه) ঘটনা বুঝতে পেরে সবাইকে আরবী ভাষার নিময়কানুন শিক্ষা করার আদেশ দেন।

[নাজমুদ্দুরার, কাশ্‌শাফ ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ]

সুতরাং কোরআন-হাদীস সঠিকভাবে বুঝতে হলে আরবীভাষার ব্যকারণের উপর দক্ষ হওয়া ভীষণ জরুরী বিষয়।

**[২] হাকীকত ও মাযাজ।**

হাকীকত (حقيقة) বলতে বোঝায় প্রকৃত অর্থ আর মাযাজ (مجاز) বলতে বোঝায় রুপক অর্থ। ভাষা ব্যাবহারের সময় কখনও কখনও কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার না করে রুপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন স্বামী যদি স্ত্রীকে চাঁদ বলে তবে সেটা আকাশের চাঁদ বোঝায় না। একইভাবে যুদ্ধবাজ বীরকে সিংহ বললে বনের সিংহ বোঝায় না। এসবই ভাষার রুপক ব্যবহার। কোরআন ও হাদীসে বহু শব্দকে রুপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]

❝ ফজরের সাদা সুতা কালো সুতা হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাকো। ❞ [সূরা

বাকারা/১৮৭]

আয়াতে রমজান মাসে সাহরী খাওয়ার শেষ সময় বর্ণনা করা হচ্ছে। কিছু কিছু সাহাবী (رضي الله عنهم) এই আয়াতে সুতা (خيط) শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেছিলেন তারা বলিশের নিচে সাদা ও কালো দুটি সুতা রেখে লক্ষ করতেন কখন একটিকে আরেকটি হতে চেনা যায়। আদী ইবনে হাতীম (رضي الله عنه) এমনটি করার পর সকালে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ: جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادِي عِقَالَيْنِ

﴿ হে আল্লাহর রসুল আমি আমার বালিশের নিচে দুটি সুতা রেখেছিলাম। ﴾

রসুলুল্লাহ (ﷺ) শুনে বললেন,

إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الخَيْطُ الأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ

﴿ যদি তুমি [আকাশের] সাদা সুতা আর কালো সুতাকে বলিশের নিচে রেখে থাকো তবে তো তোমার

বালিশ অনেক প্রশস্ত ! ﴾ [সহীহ বুখারী]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে রসলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ

﴿ তোমার বালিশ দেখছি খুবই প্রশস্ত! ওটা তো রাতের আধার আর দিনের আলো। ﴾ [সহীহ মুসলিম]

অর্থাৎ আয়াতে সুতা শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং দিগন্তের সাদা ও কালো রশ্মিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কিছু সাহাবা (رضي الله عنهم) শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে নেওয়ার কারণে ভুল বুঝেছেন।

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]

﴿ নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। ﴾ [সূরা তাওবা/২৮]

এখানে নাপাক বলতে একজন মুশরিক কুকুর ও শুকরের মতো নাপাক এমন বোঝানো হয়নি। বরং বোঝানো হয়েছে তার আকীদা চিন্তা দর্শন ইত্যাদি নাপাক। এ কারণে কোনো মুশরিকের ঘাম, চোখের পানি ইত্যাদি শরীরে লাগলে সে স্থান ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

যে আয়াতে মুমিনকে হত্যা করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ আছে সেখানে চিরস্থায়ী বা খুলুদ (خلود) শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করছে না।

ইমাম বায়দাবী আয়াতটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করার সময় বলেন,

أو المراد بالخلود المكث الطويل

﴿ এমন হতে পারে যে এখানে চিরস্থায়ী বলতে লম্বা সময় বোঝানো হয়েছে। ﴾

[তাফসীরে বায়দাবী]

খন্দকের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) বানু কুরাইজার উপর আক্রমন করার ইচছা করলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বললেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

﴿ কেউ যেনো বনু কুরাইজাতে না পৌছে আসরের সলাত না পড়ে। ﴾

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পক্ষ হতে এটা ছিলো স্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) দ্রুত বানু করাইজার

দিকে রওয়ানা হলেন। বানু কুরাইজাতে পৌছানোর পূর্বেই আসরের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ

﴿ তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন আমরা বানু কুরাইজাতে না পৌছে সলাত আদায় করবো না অন্য দল বললেন আমরা এখানেই সলাত আদায় করে নেবো রসুলুল্লাহ (ﷺ) এটা উদ্দেশ্য করেন নি। ﴾ [সহীহ বুখারী]

অন্যান্য বর্ণনাতে এসেছে প্রথম দলটি বললো, রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উপর স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যেনো আমরা বানু কুরাইজায় না পৌছে আসরের সলাত আদায় না করি। অতএব এরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সলাত আদায় করে [তিবরানী]। দ্বিতীয় দলটি বলেছিল রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে তোমরা সলাত ত্যাগ করো

[মুস্াদরাকে হাকিম]। বরং তিনি চেয়েছেন তোমরা দ্রুত যাও।

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

«রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এই খবর পৌছানো হলে তিনি কাউকেই তিরষ্কার করেন নি।»

[সহীহ বুখারী]

এখানে দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার অর্থ নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কথাটির প্রকৃত অর্থের উপর আমল করেছেন আর কেউ এটার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য মনে করেন নি। তারা মনে করেছেন বানু কুরাইজায় না যেয়ে আসরের সলাত পড়ো না এই কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো দ্রুত যাও যাতে আসরের সময় শেষ হওয়ার আগেই বানু করাইজাতে পৌছাতে পারো। উভয় দল নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে গবেষণা করে যা সঠিক মনে হয়েছে তার উপর আমল করেছেন সেকারণে রসুলুল্লাহ (ﷺ)

কাউকেই তিরষ্কার করেননি। ভাষার প্রয়োগবিধি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই তারা এই ধরণের মতপার্থক্যকে অর্থহীন মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব কোরআন হাদীস সঠিকভাবে বুঝতে হলে ভাষার প্রয়োগ ও ব্যাবহারের নিয়মনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

পূর্বে আমরা যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি তার মধ্যে যে হাদীসে আত্মহত্যাকারী জাহান্নামের ভিতর চিরস্থায়ীভাবে শাস্তি পেতে থাকবে বলা হয়েছে সেটার ক্ষেত্রেও একই কথা।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) যেসব হাদীসে বংশ তুলে গালি দেওয়া, মৃতের জন্য বিলাপ করা, অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি কাজকে কুফরী হিসাবে গন্য করেছেন। বা এসবে লিপ্ত হলে জান্নাত তার উপর হারাম এমন বলেছেন। ঐসব হাদীসে কুফরী বলতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এমন কুফরী বোঝানো হয়নি। জান্নাত হারাম বলতেও সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমন বোঝানো হয় নি। তাগলীজ বা অধিক কঠোরতার জন্যই এভাবে বলা হয়েছে।

এসকল ব্যাপারই হাকীকত-মাযাজ বা প্রকৃত অর্থ ও রুপক অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি কেউ এই মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে কোরআনের বহু আয়াত ও রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বহু হাদীসের সঠিক অর্থ জানা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইমাম সুয়ূতী বলেন,

ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن

﴾ যদি কোরআনে রুপক বলে কিছু না থাকতো তবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যেতো। ﴿

[আলইতকান]

## [৩] আল-আমর ওয়ান-নাহী বা আদেশ-নিষেধ।

আরবীতে আদেশ দেওয়ার জন্য যে শব্দ ব্যাবহার করা হয় তাকে আমর (الامر) বলে। আমরের সীগা সাধারণত কোনো কিছু ফরজ বোঝাতে ব্যাবহার করা হয়। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]

﴾ সলাত কায়েম করো, যাকাত দাও। ﴿

[সূলা বাকারা/৪৩]

কিন্তু সব সময় আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে ফরজ ও ওয়াজিব বোঝায় না। আদেশ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ বোঝানো হয়।

**[ক]** ফরজ বা ওয়জিব বোঝানো যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

**[খ]** ফরজ বা ওয়াজিব নয় বরং করলে ভাল না করলে সমস্য নেই তথা মুস্াহাব বোঝানোর জন্য। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

«যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ বাকিতে লেনদেন করো তখন তা লিখে রাখো।»

[বাকারা/২৮২]

এখানে যে লিখে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নয় বরং তা উত্তম যদি কেউ কোনো কারণে লিখে না রাখে তবে তাতে পাপী হবে না।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ

﴾ যে কেউ ওযু করে সে নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলুক ﴿[ বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীস হতে কেউ কেউ বলেছেন ওযুতে নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা ফরজ কিন্তু জমহুর আলেমের মতে এটা সুন্নাত। অর্থাৎ তারা এখানে আদেশের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বোঝেননি।

**[গ]** কখনও কখনও আদেশ প্রদানের মাধ্যমে ফরজ বা মুস্তাহাব কিছুই বোঝানো হয় না শুধু মাত্র কাজটির বৈধ হওয়া নির্দেশ করে। যেমন, আল্লাহর বাণী,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

﴾ যখন সলাত সম্পন্ন হয় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর নেয়ামত তালাশ করো ﴿

[সূরা জুমআ/১০]

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]

﴿ যখন তোমরা হজ্জের ইহরাম ভেঙে ফেল তখন শিকার করো ﴾

[সূরা মায়েদা/২]

একবার সাহাবারা ইহরাম ভেঙে ফেললে রসুলূল্লাহ (ﷺ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ

﴿ তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও। ﴾

ইমাম বুখারী জাবির (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এই আদেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ

﴿ [এই আদেশের মাধ্যমে] বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়নি বরং পুরুষদের জন্য স্ত্রীদের বৈধ করা হয়েছে। ﴾

[সহীহ বুখারী]

এরকম বহু আয়াত রয়েছে যেখানে কোনো কাজ

আদেশের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে অথচ সেটা বাধ্যতামূলক বা মুস্তাহাব কিছুই নয়। সেটা করলে কোনো পুরস্কারের আশাও নেই বরং সেটা কেবল মাত্র বৈধ বা মুবাহ (مباح) পর্যায়ের।

**[ঘ]** কখনও কখনও সীগাতুল আমর বা আদেশ প্রদানের শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যাবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠]

«তোমরা যা খুশি আমল করো তিনি তোমরা যা কিছু করো তা দেখেন।»

[হামিম আস সাজদা/৪০]

এই আয়াতে আদেশের মাধ্যমে উপরের তিনটি অর্থের কোনোটিই উদ্দেশ্য নয়। কেননা এখানে যা খুশি আমল করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে না বা যা খুশি আমল করা বৈধও বলা হচ্ছে না।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

﴾ যদি তোমার লজ্জা না থাকে তবে যা খুশি তাই করতে পারো। ﴿

[সহীহ বুখারী]

হাদীসে যার লজ্জা নেই তার জন্য সব কিছু করা বৈধ এমন উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে তিরষ্কার করা উদ্দেশ্য।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে দুজন লোক অন্য একজনের গীবত করলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ

﴾ তোমরা নেমে গিয়ে এই মৃত গাধার মাংস হতে আহার করো। ﴿

তারা দুজন অবাক হয়ে বলল,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا

﴾ হে আল্লাহর নবী, এটা আবার কেউ খায় নাকি? ﴿

রসুলূল্লাহ (ﷺ) বললেন,

فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ

«তোমরা একটু পূর্বে তোমাদের এক ভাই সম্পর্কে যা কিছু বলেছো তা এটা খাওয়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট।» [আবু দাউদ]

এই হাদীসেও এটা খাও বলতে উক্ত গাধার মাংস খাওয়া বাধ্যতামূলক, মুস্তাহাব বা বৈধ ইত্যাদি কোনো অর্থই উদ্দেশ্য নয় বরং গীবতের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য এভাবে বলা হয়েছে।

**[ঙ]** অনেক সময় সম্মানিত কোনো ব্যাক্তি অধিনস্দের প্রতি দয়া পরবশ বা অন্যদের মাঝে তার সম্মান অক্ষুণ্য রাখার জন্য কোনো আদেশ করে থাকেন সে ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

রসুলূল্লাহ (ﷺ) একবার অনুপস্থিত থাকলে আবু বকর (رضي الله عنه) লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করতে শুরু করেন। তাদের সালাত শুরু হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) হাজির হলে আবু বকর (رضي الله عنه) পিছনে ফিরে আসতে শুরু করেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে হাত দ্বারা ইশারা করে যথা স্থানে থাকতে আদেশ করেন তবু আবু বকর (رضي الله عنه) পিছনে ফিরে আসেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ)

সলাত আদায় করার পর তাকে প্রশ্ন করলেন,

يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك

﴿ হে আবু বকর আমি তোমাকে আদেশ করার পরও তুমি কেনো স্থির থাকলে না? ﴾ [বুখারী ও মুসলিম]

আবু বকর (رضي الله عنه) বললেন, আপনি হাজির থাকার পরও আবু কুহাফার ছেলের জন্য ইমাম হয়ে সালাত আদায় করাটা শোভা পায় না।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আন নাব্বী (رحمه الله) বলেন,

وَفِيهِ أَنَّ التَّابِعَ إِذَا أَمَرَهُ الْمَتْبُوعُ بِشَيْءٍ وَفَهِمَ مِنْهُ إِكْرَامَهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ لَا تَحَتُّمُ الْفِعْلُ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَلَا يَكُونُ هَذَا مُخَالَفَةً لِلْأَمْرِ بَلْ يَكُونُ أَدَبًا وَتَوَاضُعًا وَتَحَذُّقًا فِي فَهْمِ الْمَقَاصِدِ

﴿ এতে দলীল রয়েছে যে যদি কোনো অনুসারীকে তার অনুসরণীয় ব্যাক্তি কোনো কাজের আদেশ করে আর উক্ত ব্যাক্তি বুঝতে পারে এই আদেশের মাধ্যমে উক্ত কাজটি বাধ্যতামূলক করা উদ্দেশ্য নয় বরং তাকে মর্যাদা দেওয়া উদ্দেশ্য তবে সে এই নির্দেশ পরিত্যাগ করতে পারে এটা অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে না বরং

আদব, বিনম্রতা ও ভাষা বোঝার দক্ষতা বলে পরিগনিত হবে। ﴾ [শারহে মুসলিম]

সীগাতুন নাহী বা নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ সীগাতুল আমর বা আদেশ সূচক শব্দের মতো বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

**[ক]** কোনো কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম সাব্যস্ করার জন্য। যেমন (لا تقربوا الزني) তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়োনা, (لا تأكلوا الربي) সুদ খেয়ো না ইত্যাদি।

**[খ]** হারাম নয় বরং মাকরুহ বোঝানোর জন্য। উম্মে আতীয়্যা বলেন,

نهيما عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

﴿ আমাদের (মেয়েদের) জানাযার (মৃতদেহের) পিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে তবে এটা হারাম করা হয়নি। ﴾ [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ অনেক সময় কোনো কিছু হতে নিষেধ করা হয় কিন্তু এর মাধ্যমে হারাম করা উদ্দেশ্য হয়না তবে উক্ত

কাজটি পরিত্যাগ করা উত্তম এমন উদ্দেশ্য হয়।

**[গ]** অনেক সময় কোনো কাজ কররে নিষেধ করা হয় অথচ তার মাধ্যমে কাজটি হারাম বা মাকরুহ উদ্দেশ্য নয় বরং কাজটি বৈধ। রসুলূল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

«তুমি সাত দিনে কোরান খতম করো এর অধিক করো না।»

[সহীহ বুখারী]

কোনো কোনো হাদীসে তিন দিনের কথা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে আলেমদের মতামত হলো কোরানের অর্থে বা তিলাওয়াতে কোনোরুপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি না করে যত কম সময়ে পারা যায় তেলাওয়াত করতে দোষ নেই। ইবনে হাযার (رحمه الله) বলেন,

وَثَبَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السّلف إِنَّهُم قرؤوا الْقُرْآنَ فِي دُونِ ذَلِكَ

«পূর্ববর্তী বহুসংখক ওলামায়ে কিরাম হতে বর্ণিত আছে যে তারা তিন দিনের কমে কোরআন খতম

দিয়েছেন। ﴾

[ফাতহুল বারী]

এর পর তিনি বলেন,

قَالَ النَّوَوِيُّ وَالِاخْتِيَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ

﴿ ইমাম নাব্বী বলেন সঠিক কথা হলো ব্যাক্তি ভেদে এটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ﴾

এর পর ইমাম নাব্বী বিভিন্ন ব্যাক্তির জন্য বিভিন্ন রকম অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন গবেষকের উচিত যতটুকু সম্ভব চিন্া গবেষণা করে পাঠ করা। অন্যান্য দ্বীনী কাজে লিপ্ত ব্যাক্তির উচিৎ উক্ত কাজের ক্ষতি না করে যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করা। আর সাধারণ লোকেরা তড়াহুড়া না করে এবং নিজেকে ক্লান্ না করে যত বেশি পারে পাঠ করতে পারে।

কিছু লোক আছে কোনো ইমাম বা মুজতাহিদ তিন দিনের কমে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন এমন কথা শুনলেই বলে ওঠেন উক্ত ইমাম পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছেন কারণ রসুলুল্লাহ (ﷺ) তিন দিনের কমে কোরআন তিলাওয়াত করতে নিশেধ করেছেন। নিশেধ

করা হলেই যে হারাম বোঝায় না এ বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ থাকার কারণেই এরা এমন কথা বলে থাকে।

**[ঘ]** অনেক সময় সীগাতুল অমরের মতো সীগাতুন নাহীও সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়। নুহ (عليه السلام) তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বললেন,

﴿ثم اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [يونس: ٧١]

«তোমরা আমাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করো আর আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না।» [ইউনুস/৭১]

এখানে অবকাশ দিয়োনা এই কথার মাধ্যমে আসলে অবকাশ দিতে নিষেধ করা হচ্ছে না বরং এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে সীগাতুন নাহী ব্যাবহার করা হয়েছে।

**[ঙ]** অনেক সময় অধিনস্দের উপর সহজ করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো কারণে কোনো কাজ হতে তাদের নিষেধ করা হয়। উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। যেমন রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বললেন,

لاَ تُوَاصِلُواْ

﴿ তোমরা সওমে বিসাল করো না। ﴾
কোনোরুপ পানাহার না করে একাধারে কয়েক দিন সওম পালন করাকে সওমে বিসাল বলা হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে এমন সওম পালন করতে দেখে সাহাবায়ে কিরামও তা করতে শুরু করলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেন। হাদীসের পরবর্তী অংশে এসেছে,

فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ

﴿ কিন্তু তারা সওমে বিসাল পরিত্যাগ করলো না। ﴾
[সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করার পরও সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) সওমে বিসাল থেকে বিরত হলেন না। এর ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার (رحمه الله) বলেন,

وَمِنْ أَدِلَّةِ الْجَوَازِ إِقْدَامُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوِصَالِ بَعْدَ النَّهْيِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ وَإِلَّا لَمَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ

﴿ সওমে বিসাল যে রাখা বৈধ এ ব্যাপারে দলীল হলো রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আদেশের পরও সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) এটা হতে বিরত হন নি। এতে বোঝা

যায় তারা এখানে নিষেধাজ্ঞা হতে হারাম বোঝেন নি বরং ভিন্ন অর্থ বুঝেছেন। ﴾

[ফাতহুল বারী]

**[৪] আম - খাছ।**

আম (العام) বলতে বোঝায় কোনো কিছু সাধারণভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়া আর খাছ (الخاص) বলতে বোঝায় কোনো কিছু বিশেষভাবে কারো উপর প্রযোজ্য হওয়া। যেমন যে দা'ওয়াতে ধনী গরীব সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় তাকে আমরা বলি আম দা'ওয়াত আর যে দা'ওয়াতে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যাক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হয় সেটাকে বলি খাছ দা'ওয়াত। একই ভাবে যে বৈঠকে সবাইকে বসতে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় আম বৈঠক আর যেখানে কেবল গণ্য মান্য ব্যক্তিদের বসতে দেওয়া হয় সেটাকে বলে খাছ বৈঠক। এ ব্যাপারে সমস্যা হলো কোরআন-হাদীসে অনেক বিধিবিধান আমভাবে বলা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর উদ্দেশ্য খাছ। আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা খাছভাবে বলা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য আম।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ প্রচুর। কোরআন-হাদীসে যে বিধানই বর্ণনা করা হয়েছে তা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আল্লাহ বলেন সলাত কায়েম করো। হায়েজগ্রস্থ মহিলা, পাগল, নাবালেগ ইত্যাদি ব্যাক্তিরা এই নির্দেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লাহ (ﷻ) জেনাকারীকে বেত মারার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু বিবাহিত জেনাকারী এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। হাদীসের মাধ্যমে প্রমানিত যে, বিবাহিত জেনাকারীকে রজম [পাথর নিক্ষেপ] করে হত্যা করতে হবে। খারেজীরা বলে এই হাদীস কোরআনের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে অগ্রণযোগ্য। তারা রজমের বিধানকে অস্বীকার করে। এভাবে প্রায় প্রতিটি বিধান কোনো না কোনোভাবে খাছ হয়ে গেছে।

ইমাম সুয়ূতি বলেন,

ما من عام إلا وقد خص

﴿ এমন কোনো আম নেই যা কোনো না কোনো ভাবে খাছ হয়ে যায় নি। ﴾

বিপরীত দিক হতে অনেক সময় কোনো কিছু খাছভাবে বলা হয় কিন্তু উদ্দেশ্য হয় আম। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]

﴿ হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। কেননা এতে তারা সুযোগ পেয়ে যায় যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে। আর তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলো। ﴾ [আহযাব/৩২]

এই আয়াতে বিশেষভাবে নবীর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে পরপূরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করা হচ্ছে কিন্তু এই আয়াতের বিধান সকল মেয়েদের উপর প্রযোজ্য।

পূরুষদের জন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করা হারাম এ সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]

«এবং তোমাদের স্ত্রীদের ঐ সকল মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে লালিত পালিত হয়।» [সূরা নিসা/২৩]

আয়াতে খাছ ভাবে স্ত্রীর অন্য পক্ষের যেসব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর কোলে পালিত হয় উক্ত স্বামীর জন্য তাকে বিয়ে করা হারাম বলা হচ্ছে। খাছ ভাবে বলার কারণে কেউ কেউ মনে করেছেন যেসব মেয়েরা পরবর্তী স্বামীর গৃহে পালিত হয় না তাদের বিয়ে করা হারাম নয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এ বিষয়ে কিছু দ্বিমত ছিল। তবে জমহুর [বেশিরভাগ] আলেম বলেছেন এখানে খাছভাবে বলা হলেও উদ্দেশ্য আম। সেকারণে কোলে পালিত হোক বা অন্য কোথাও পালিত হোক স্ত্রীর অন্য পক্ষের মেয়ে বিবাহ করা বৈধ নয়।

দেখা যাচ্ছে আম-খাছের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না

থাকলে। কেরআন-হাদীস সঠিকভাবে বোঝা স্বম্ভব নয়।

## [৫] নাসিখ-মানসুখ।

নাসখ (نسخ) অর্থ রহিত বা বাতিল হয়ে যাওয়া। মানসুখ (منسوخ) অর্থ যে আয়াতটি বাতিল হয়ে যায় আর নাসিখ (ناسخ) অর্থ যে আয়াতটির মাধ্যমে অন্য কোনো আয়াত বাতিল হয়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? ﴾ [বাকারা/১০৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١]

﴿আর যখন আমি এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত আনয়ন করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন। তখন তারা বলে, আপনি তো মনগড়া কথা করেন। আসলে তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।﴾

[নাহল/১০১]

ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন,

وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ

﴿রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবারা তার কথার মধ্যে সর্বশেষ কথাটি গ্রহণ করতেন।﴾ [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর একটি আদেশ অন্যটি দ্বারা রহিত হয়ে যেতো সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম শেষের আদেশটি অনুসরণ করতেন। সুতরাং এটা প্রমানিত হলো যে, আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে যেতে পারে একইভাবে

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর একটি কথা পরবর্তী আরেকটি কথার মাধ্যমে মানসুখ হতে পারে। কোরআন-হাদীসে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ইমাম সূয়ূতির মতে মানসুখ আয়াত ২০ টি, মুল্লা জিয়ূন বলেছেন ৪০ টি, অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে না জানলে কিরুপ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে তা বোঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণ পেশ করবো। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

«তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ইনসাফের সাথে ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ মান্য করা জরুরী।» [বাকারা/১৮০]

এই আয়াতে পিতামাতার জন্য ওসীয়ত করার স্পষ্ট

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একজন কোরানে হাফিজ যদি সসগ্র কোরআন তালাশ করেন তবু এই নির্দেশের বিপরীত কোনো নির্দেশ খুজে পাবেন না। এই আয়াতটি মানসুখ কিনা বা মানসুখ হলে এটার কোন অংশ মানসুখ সমগ্র কোরআন পড়ে মুখস্থ করে নিলেও তিনি সেটা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু বিশ্বস্ কোনো একটি তাফসীর গ্রন্থ হতে এই আয়াতটির তাফসীর দেখে নিলেই জানা যাবে যে, এই আয়াতের "পিতামাতার জন্য" অংশটুকু মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

﴾ যার যা পাওনা আল্লাহ তাকে তা দিয়েছেন অতএব এখন আর কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা যাবে না। ﴿ [আবু দাউদ/আলবানী সহীহ বলেছেন]

আলী (رضي الله عنه) একবার একজন কাজী [বিচারক] কে ডেকে বললেন,

أتعرف الناسخ من المنسوخ

﴾ তুমি কি নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে জানো? ﴿

উক্ত কাজী না সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন,

هلكت وأهلكت

﴿ তুমি তো নিজেও ধ্বংস হয়েছো অন্যকেও ধ্বংস করেছো। ﴾

[আলইতকান, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক]

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি একজন বক্তাকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। সে না সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন,

فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه

﴿ তাহলে তুমি আমাদের মসজিদ হতে বের হয়ে যাও। এখানে কোনো আলোচনা করো না। ﴾ [কানযুল উম্মাল]

আলী (رضي الله عنه) এর এই কথাটি উপরে বর্ণিত সবগুলো বিষয়ের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যাক্তি যেমন ফতওয়া দেওয়া ও দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা করার অযোগ্য একইভাবে আম-খাছ, হাকীকত-মাযাঝ ইত্যাদি বিষয় সমূহের মধ্যে কোনো একটি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যাক্তির ক্ষেত্রেও একই বিধান।

কেননা এই সব বিষয়ের কোনো একটির ব্যাপারে অজ্ঞ থাকলে কোরআন ও হাদীস সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় আর যে কোরআন হাদীস নিজেই বুঝতে সক্ষম নয় তার জন্য অন্য কাউকে বোঝাতে যাওয়া শোভা পায় না।

## [#] কোরআন হাদীস সঠিকভাবে বুঝতে হলে যেসব যোগ্যতা অর্জন করা পূর্বশর্তঃ

আশাকরি উপরক্ত আলোচনা হতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোরআন-হাদীসের সঠিক মমার্থ অনুধাবন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই কোরআনের কোনো আয়াত বা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব। আমরা এখন সেসব যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই ইনশাআল্লাহ।

### [১] কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কার আরবী ভাষার উপর দক্ষতাঃ

আমরা পূর্বে দেখেছি যে সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) এবং

তৎপরবর্তী উলামায়ে দ্বীন কোরআনের ভাষা বোঝার জন্য জাহেলী যুগের কবিদের কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থে কোরানের শব্দসমূহের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কবিদের কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। উমর (رضي الله عنه) বলেছেন,

يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم

«ওহে মানব সকল তোমাদের উচিৎ জাহেলী যুগের কবিতাসমূহ মুখস্থ করা কেননা তাতে তোমাদের কিতাবের তাফসীর এবং তোমাদের ভাষার অর্থ লুকিয়ে রয়েছে।»

[তাফসীরুল কুরতুবী]

কোরআনের জ্ঞানের একটি ব্যাপক অংশ আরবী ব্যাকরণ ও বাচনভঙ্গির উপর নির্ভর করে। সেসব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যারা কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করে বা ভাষাভাষা আরবী জ্ঞানের মাধ্যমে কোরআন-হাদীস হতে ফতওয়া বের করার চেষ্টা করে তারাই সবার আগে পথভ্রষ্ট হবে এতে আশ্চর্যের কিছু

নেই।

## [২] কোরআন-হাদীসের উপর ব্যাপক পড়াশুনাঃ

আমরা পূর্বে দেখেছি কোরানের কোনো একটি আয়াত অন্য আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে মানসুখ হয়ে যায়। একইভাবে কোনো একটি বিধান হয়তো একটি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় কিন্তু অন্য স্থানে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। এক স্থানে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤]

﴿ আপনি বলুন শাফায়াত কেবল আল্লাহর জন্য। ﴾

[ঝুমার/৪৪]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩]

﴿ সেদিন কারো শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না তবে যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং তার কথা পছন্দ করবেন সে ছাড়া। ﴾ [তাহা/১০৯]

যদি কেউ শুধু প্রথম আয়াতটি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে আর পরেরটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে নবী-রসুল, শহীদ-সালেহ কাউকেই কিয়ামতের দিন শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হবে না এমন বলে বসতে পারে। অনেকে এমন বলেছেও। কিন্তু অন্যান্য আয়াত ও হাদীস পাঠ করলে সে জানতে পারবে এই মত সঠিক নয়। একইভাবে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই অল্প পড়াশুনা করে মতামত ব্যাক্ত করলে তা মারাত্মক বিভ্রান্তি ও ফিতনার কারণ হবে। এমন হতে পারে যে সে কোনো মানসুখ আয়াতের উপর নির্ভর করে এমন একটি ফতওয়া দেবে সমস্ত উম্মাত যার বিরুদ্ধে। এভাবে কোরআন ও হাদীসের উপর একপেশে অধ্যায়নের ফলে হাকীকত-মাযাজ বা আম-খাছ ইত্যাদি নিয়মাবলীতে গণ্ডোগল হয়ে যাওয়া পুরোপুরি নিশ্চিত। সুতরাং কোরআন ও হাদীসের প্রশস্ত উদ্যানে যে যত বেশি বিচরণ করবে কোরআন হাদীসের ব্যাপারে তার মতামত ততবেশি সঠিক হবে।

ইমাম বাগাবী বলেন,

القرآن يفسر بعضه بعضًا فما أُجمل في موضع فُصِّل في موضع

কোরআনের একটি অংশ অন্যটির ব্যাখ্যা করে এমন হতে পারে যে কোনো বিষয় একটি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে অন্য আয়াতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে কোনো একটি আয়াতের আম বিধান অন্য কোনো আয়াত দ্বারা খাছ হয়ে যেতে পারে।

[তাফসীরে বাগাবী]

কাছাকাছি কথা তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে।

**[৩] আসবাবে নুযুল বা শানে নুযুল।**

নাযিলের দিক হতে কোরানের আয়াত সমূহ দুই প্রকার। **[ক]** কিছু কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। **[খ]** কিছু আয়াত কোনো ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা ছাড়ায় নাযিল হয়েছে। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আয়াত নাযিল হয় উক্ত ঘটনাকে ঐ আয়াতের শানে নুযুল বা সাবাবে নুযুল বলা হয়। কোরআনের কোনো আয়াতের সঠিক মমার্থ

অনুধাবনের জন্য উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অবহিত থাকা জরুরী। জালালুদ্দীন সুয়ুতী (رحمه الله) বলেন,

قال الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

﴿ আল-ওয়াহিদী বলেছেন কোনো আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা না জেনে তার তাফসীর করা স্বম্ভব নয়। ﴾

[আল-ইতকান]

ইবনে দাকীকিল ঈদ বলেন,

بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن

﴿ কোরআনের সঠিক অর্থ জানার ক্ষেত্রে শানে নুযুল বর্ণনা করা খুবই শক্ত একটি পদ্ধতি। ﴾ [আল-ইতকান]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (رحمه الله) বলেন,

وَمَعْرِفَةُ " سَبَبِ النُّزُولِ " يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ

﴾ কোনো আয়াত কোন ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হলো এটা জানা থাকলে আয়াটির অর্থ বোঝা সহজ হয় কেননা কোনো কিছুর কারণ সম্পর্কে জানলে মূল বিষয়টি সম্পর্কে জানার পথ খুলে যায়। ﴿ [মাজমুয়ায়ে ফতওয়া]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

﴾ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করো আর নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। ﴿

[বাকারা/১৯৫]

বেশ কিছু সাহাবা অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে একজন ব্যাক্তি শত্রুর ভিতর প্রবেশ করে দুঃসাহসের সাথে যুদ্ধ করছিল। লোকেরা তাকে বলছিল,

مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ

﴾ থামো, থামো, ..... এই ব্যক্তি দেখি নিজেকে

ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।

তারা উপরে উল্লেখিত আয়াতটিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজেকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল মনে করছিল। তখন আবু আয়্যুব আল আনসারী (رضي الله عنه) বললেন,

إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا "، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

আমরা যারা আনসার তাদের ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যখন আল্লাহ তার নবীকে বিজয় দিলেন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন আমরা বললাম, [এখন আমরা আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করার দিকে মনযোগ দেবো। তখন আল্লাহ (سبحانه وتعالى) নাযিল করেন "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করো আর নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"

[আবু দাউদ/আল-বানী সহীহ বলেছেন]

দেখা যাচ্ছে শানে নুযুল জানা না থাকার কারণে একদল লোক আয়াতটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যাবহার করছিলো। কিন্তু শানে নুযুল সম্পর্কে জানার পরই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

সুতরাং একজন গবেষককে কোরআনের আয়াতের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার সময় অবশ্যই উক্ত আয়াতটির শানে নুযুল সম্পর্কে জানতে হবে।

**[৪] প্রখর মস্তিষ্ক ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধিঃ**

আলী (رضي الله عنه) কে প্রশ্ন করা হলো আপনার নিকট কি অন্য কোনো বই আছে? তিনি বললেন,

لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

﴾ না। শুধু আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে বোধ শক্তি দেওয়া হয় তা ছাড়া আমার নিকট অন্য কিছু নেই। ﴿

[সহীহ বুখারী]

কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কিতাব ও রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন তাকে

প্রখর মস্কিষ্কের অধিকারী হতে হবে। একইসাথে তাকে নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখেছি যে কোরানের আয়াত সমূহ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনোটি রুপক অর্থে, কোনোটি প্রকৃত অর্থে, কোনোটি আম, কোনোটি খাছ। যদি কারো মস্কিষ্ক পূর্ব হতেই কোনো একটি মতাদর্শ বা আকীদা বিশ্বাসে আকৃষ্ট বা প্রভাবিত হয়ে যায় তবে সে তার মত অনুসারেই কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে থাকে। নিজের ইচ্ছামত কোনো আয়াতকে মানসুখ (منسوخ) বা মাখছুছ (مخصوص) বলে দাবী করে। এভাবে হাকীকত-মাযাজ ও আম-খাছের বিষয়টি যত্র তত্র ব্যাবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেলে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের পর হতে এ পর্যন্ত যতো বাতিল ফিরকা উদ্ভব হয়েছে তারা এভাবেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। একারণে কোরআন-হাদীস সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রখর মস্কিষ্ক ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

**[৫] তাকওয়া**

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]

﴿ হে ঈমানদাররা যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে তিনি তোমাদের ফুরকান [হক্ক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি] দান করবেন। ﴾

[আনফাল/২৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٢١٣]

﴿ যে সব বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছিলো আল্লাহ ঐ সব বিষয়ে মুমিনদের সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন। ﴾

[বাকারা/২১৩]

সুতরাং অন্যান্য উপকরণগুলোর সাথে সাথে তাকওয়া যোগ না হলে সত্য খুজে পাওয়া যাবে না। একইভাবে অন্যান্য উপকরণ বাদে শুধু তাকওয়ার মাধ্যমেও সত্য

খুজে পাওয়া যাবে না। যেমন পারেনি খারেজীরা। তাদের তাকওয়া, আমল, নিষ্ঠা সব কিছুই ছিল উন্নত মানের কিন্তু কোরআন বোঝার ব্যাপারে তারা যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছিল তা ভুল ছিল। তারা সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজেরা কোরআন বুঝতে চেয়েছিল এবং এর ফলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

কোরআন-হাদীস হতে জ্ঞান অর্জনের জন্য যেসব যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন বলে আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলোর উপর দৃষ্টি দিলে একজন পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এইধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক কম সংখকই হয়ে থাকে একারণে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

﴾ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর বুঝ প্রদান করেন। ﴿

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]

«তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাত [গভীর জ্ঞান] দান করেন। আর যাকে হিকমাত দান করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যান দেওয়া হয়।» [বাকারা/২৬৯]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

«দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে হিংসা করা যায় না। যে ব্যাক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সত্যের জন্য তা ব্যায় করার মানসিকতাও তাকে দিয়েছেন আর যে ব্যাক্তিকে আল্লাহ হিকমাত [গভীর জ্ঞান] দিয়েছেন সে তার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ফয়সালা করে এবং সেটা অন্যকে শিক্ষা দেয়।»

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এই সকল হাদীসের উপর চিন্া গবেষণা করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে দ্বীনের গভীর বুঝ প্রদান করা হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম সংখকই থাকবে। কেননা হিংসা কেবল ঐ বিষয়েই করা হয় যা বিরল ও দূর্লভ। যখন এই ধরণের গভীর বুঝ সম্পন্ন আলেম বিদ্যমান থাকবে না তখন মানুষ এমন কিছু লোকের নিকট ফতওয়া প্রার্থী হবে যারা নিজেদের আলেম হিসাবে পরিচয় দিলেও তাদের মধ্যে সঠিক ইলম থাকবে না। তাদের ফতওয়াই মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

«নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের অন্র হতে জ্ঞান ছিনিয়ে নেন না বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি জ্ঞান উঠিয়ে নেন। এমন কি যখন একজন আলেমও বিদ্যমান থাকবে না তখন অজ্ঞ লোকেরা মানুষের উপর নেতৃত্ব পেয়ে যাবে। তাদের নিকট প্রশ্ন করা হবে আর তারা জ্ঞান ছাড়া উত্তর দেবে ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।» [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

## [#] কোরআন-হাদীস বোঝার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতের গুরুত্বঃ

অনেকে প্রশ্ন করেন, কোআন হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা সলফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামদের অনুসরণ করতে হবে কেনো? সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি তিনটি কারণে আমাদের পূর্বববর্তী ওলামায়ে কিরামদের অনুরসণ করতে হবে।

[১] কোরআন-হাদীসের সঠিক মমার্থ বোঝার জন্য যেসব যোগ্যতা থাকা আমরা জরুরী বলে উল্লেখ করেছি সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে চিন্া করলে দেখা যাবে সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের মধ্যে ঐ সকল যোগ্যতা যতটা বিদ্যমান ছিল আমাদের মধ্যে তার বিন্দু মাত্র একত্রিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথমত সমসাময়িক আরবী ভাষা বা উক্ত ভাষার লোকদের বাচনভঙ্গির ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের কাছাকাছি সময়ের ওলামায়ে দ্বীনের যে দক্ষতা ছিল আমাদের পক্ষে তার ধারে কাছেও পৌছানো সম্ভব নয়। কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা

প্রযোজ্য। কোরান হাদীস তাদের সামনে নাযিল হয়েছিল। কোন আয়াত কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হচ্ছে তা তারা স্বচক্ষে অবলোকন করতেন। কোরআন ও হাদীসের যতটুকু অংশ তারা নিজেদের বক্ষে ধারণ করেছিলেন তা আমাদের নিকট অকল্পণীয় ও অসম্ভব মনে হয়। সে সময় জ্ঞানের পরিবেশ ছিল। জ্ঞানী ব্যাক্তিরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে মত বিনিময় করতেন। একজন আলেম কোনো মল্যবান কথা বলার সাথে সাথেই শত সহস্র ছাত্র সেটা লিখে নিতো। বর্তমানে একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি যদি সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া যায় তবে তার সাথে আলোচনা করার মতো কোনো আলেম বা তার কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার মতো কোনো ছাত্র মেলে না। ইমাম নাব্বী বলেন,

ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما

« কোনো বিষয়ে পারদর্শী একজন আলেমের সাথে কিছু সময় আলোচনা করা বহু সময় বরং বহু দিন কিতাব পড়া ও মুখস্থ করার তুলনায় বেশি উপকারী। »

যদি স্বচ্ছ চিন্া ভাবনার কথা ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে আমরা এমন এক যুগে আছি যখন বিভিন্ন বাতিল চিন্া-দর্শন আমাদের মন মগজ আবিষ্ট করে রেখেছে। বিভিন্ন মহল হতে বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগের প্রবল চাপে আমাদের মস্স্কি বিকৃত হওয়ার পথে। এই অবস্থায় যদি স্বাধীনভাবে কোরআন-হাদীসে চিন্া-গবেষণা করার চেষ্টা করা হয় তবে দেখো যাবে বর্তমান সময়ের বাতিল আদর্শ ও মতবাদ গুলোর কোনো একটিতে প্রভাবিত হয়ে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এর পরিণাম হিসাবে জন্ম নেবে একের পর এক বিদয়াত ও গোমরাহী। অপর দিকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী কয়েকটি যুগ জ্ঞান ও ঈমানের দিক হতে সোনালী যুগ ছিল।

**[২]** স্বয়ং রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বত্তোম হলো আমার

সাহাবারা, তার পর যারা আসবে, তারপর যারা আসবে।

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

তোমাদের উপর দিয়ে যে সময়ই অতিবাহিত হবে পরের সময়টি তার চেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এই কথা বলার পর বলেন,

لَسْتُ أَعْنِي رَخَاءً مِنَ الْعَيْشِ يُصِيبُهُ وَلَا مَالًا يُفِيدُهُ وَلَكِن لَا يَأْتِي عَلَيْكُم يَوْم الا وَهُوَ أَقَلُّ عِلْمًا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ

আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে সম্পদ ও প্রাচুর্য কমে যাবে বরং তোমাদের উপর যে দিনই আসবে পরের দিনটি আগের দিনের চেয়ে জ্ঞানের দিক হতে কম হবে।

[ফাতহুল বারী]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

«তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে সে অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত ও সত্যপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মেনে চলা।»

[আবু দাউদ,আলবানী সহীহ বলেছেন]

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা মুর্খতার যুগে রয়েছি এবং আমাদের পূর্বে উত্তম যুগসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতএব আমাদের করনীয় হলো ঐ যুগের ওলামায়ে দ্বীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মতামত ও কর্মপদ্ধতিকে কোরআন ও হাদীস সঠিকভাবে বোঝার একমাত্র মাধ্যম মনে করা।

**[৩]** পূর্বে আমরা দেখেছি যে, কোরআন ও হাদীস বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়। প্রকৃত অর্থ,

রুপক অর্থ, আম-খাছ, ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়মকাননের মাধ্যমে কোনো আয়াত বা হাদীসকে ব্যাখ্যা করা হয়। যদি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সীমা নির্ধারণ না করা হয় তবে সকল বিদয়াতী ফিরকা কোরআন হাদীসকে সহজেই নিজেদের পক্ষে ব্যাবহার করবে। এভাবে ব্যাপক ফিতনা দেখা দেবে।

কোনো মুমিনকে হত্যা করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামের কথা যে আয়াতে বলা হয়েছে সেখানে চিরস্থায়ী বলতে প্রকৃত অর্থে চিরস্থায়ী বোঝানো হয়নি বরং লম্বা সময় বোঝানো হয়েছে। এই কথার উপর নির্ভর করে যদি কেউ বলে, কোরআনে বলা হয়েছে জান্নাতে মুমিনরা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। এখানেও চিরস্থায়ী অর্থ লম্বা সময় অশেষ সময় নয়। তবে এই ব্যাক্তির উত্তরে কি বলা যেতে পারে? এর সঠিক উত্তর হলো, আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো কোরআনের ব্যাখ্যা করতে পারি না। কোন্ আয়াতে প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে আর কোনটিতে রুপক অর্থ বুঝতে হবে তা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে নির্ণয় করতে হবে। সকল ওলামায়ে কিরামের মতামত হলো খুলদ শব্দটি প্রথম

আয়াতে রুপক অর্থে এসেছে আর দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃত অর্থে এসেছে। তাদের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা দেওয়া গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বলে গণ্য হবে।

এমন আরো প্রচুর আয়াত ও হাদীস রয়েছে যদি পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামকে উপেক্ষা করে সেসবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তবে এমন সব আজব ও উদ্ভট ফতওয়া বের হবে যা দেখে ইবলীসও লজ্জা পাবে। খারেজী, কাদরীয়া, মু'তাজিলা ইত্যাদি মতবাদের সৃষ্টিই হয়েছিল সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজেরদের মতো করে কোরআন বুঝার চেষ্টা করার কারণে।

এই সকল উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে যদি আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করতে হয় তবে সালফে সালেহীনদের অনুসরণ ছাড়া বিকল্প নেই।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) যখন খারেজীদের সাথে আলোচনা করার জন্য গেলেন তখন তারা বললো আপনি কার পক্ষ হতে আসছেন? তিনি বললেন,

جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله

﴿ আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবীদের পক্ষ হতে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছি যাদের উপর ওহী নাযীল হয়েছে এবং তারা তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অধিক অবগত। ﴾

[তিবরানী, মু'জামে কাবীর]

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজাজের নিকট কাদরিয়ারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল হিসাবে কিছু আয়াত লিখে পাঠালে তিনি বললেন,

وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ

﴿ যদি তোমরা বলো, এই সব আয়াত কেনো নাযিল হয়েছে? তবে আমি বলবো এগুলো তারা [সাহাবায়ে কিরাম] পাঠ করেছেন তারা এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা জানতেন যা তোমরা জানো না। এগুলো পাঠ করার পরও তারা তাকদীরে বিশ্বাস করতেন। ﴾

[আবু-দাউদ, আলবানী সহীহ বলেছেন]

দেখা যাচ্ছে খারেজী ও কাদরিয়াদের ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমান করার জন্য সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ও মতামতকে দলীল হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। এছাড়া কোনো উপায় নেয়। যদি প্রত্যেককে তার নিজ মত অনুসারে কোরআন-হাদীস ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। বিদয়াত ও গোমরাহীর ছয়লাভ বয়ে যাবে। আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চাই।

## [#] সালফে সালিহীন বা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত মেনে চলার অর্থ কি?

সালফে সালেহীন (السلف الصالحين) অর্থ পূর্ববর্তী নেককার ওলামায়ে কিরাম। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবা ও তাদের পরবর্তী কয়েকযুগের ওলমায়ে কিরামকে সালফে সালেহীন বলা হয। কোরআন-হাদীস সঠিকভাবে বোঝা ও মেনে চলার জন্য সালফে সালেহীনদের মতামতের অনুসরণ করা কতটা জরুরী সে বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে আমরা সালফে সালেহীনদের

অনুসরণ করি। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজেদের সালাফী নামে পরিচয় দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এরা ইজমা অস্বীকার করে, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের বিরাট অংশের নিকট প্রচলিত ও প্রশিদ্ধ মতকে পরিত্যাগ করে বিরল মতের উপর আমল করে বা এমনসব নতুন মত আবিষ্কার করে ইসলামের ইতিহাসে যার কোনো নজীর নেই। এরা এমন সব কাজকে বিদয়াত ও গোমরাহী বলে প্রচার করে আমাদের পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম যা উত্তম মনে করতেন বা কমপক্ষে দোষের মনে করতেন না। এতো কিছুর পরও তারা সালাফদের অনুসরণের দাবী করে এবং নিজেদের সালাফী বলে পরিচয় দেয়। এদের দিমুখী কর্মনীতির কারণে বর্তমানে সালাফে সালেহীনদের অনুসরণ বলতে আমরা কি বুঝবো সেটা জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নিম্মোক্ত পাচটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের অনুসরণ বলতে কি বোঝায় তার প্রকৃত রুপরেখা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

**[১] ইজমাকে অকাট্য দলীল হিসাবে মেনে নেওয়া।**

ইজমা (الإجماع) অর্থ ঐক্যমত। সাহাবায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন শরীয়তের যেসব ব্যাপারে একমত হয়েছেন তাকে ইজমা (الإجماع) বলা হয়। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের অনুসরণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো তাদের ঐক্যমত বা ইজমাকে অকাট্য দলীল মনে করা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة

﴿ আল্লাহ আমার উম্মাতকে ভ্রান্তির উপর একত্রিত করবেন না। ﴾

[তিরমিযী/আলবানী সহীহ বলেছেন]

ইমাম সুয়ূতী বর্ণনা করেন, একজন বৃদ্ধ ইমাম শাফেঈ (رحمه الله) এর নিকট এসে বললো,

إيش الحجة في دين الله

শরীয়তের দলীল কি কি ?

ইমাম শাফেঈ বললেন, আল্লাহর কিতাব, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত, উম্মাতের ঐক্যমত ..... এতদূর বলতেই উক্ত ব্যাক্তি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো,

قال من أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله

আপনি যে বললেন উম্মাতের ঐক্যমত এটা কিভাবে বললেন, আল্লাহর কিতাবে এর কোনো প্রমান আছে?

ইমাম শাফেঈ কিছুক্ষণ নিরব থাকলে উক্ত বৃদ্ধ আবার বললো,

قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليها فإن جئت بحجة من كتاب الله في الإتفاق وإلا تب إلى الله

আমি আপনাকে তিন দিন তিন রাত সময় দিচ্ছি এর মধ্যে আপনাকে ইজমার স্বপক্ষে কোরআন থেকে দলীর পেশ করতে হবে যদি না পারেন তবে তওবা করবেন।

একথা শুনে ইমাম শাফেঈর মুখের রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিন দিন পর যখন উক্ত বৃদ্ধ উত্তরের জন্য তার নিকট আসলো তিনি আল্লাহর কিতাবের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

[النساء: ١١٥]

﴿ যে কেউ সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমীনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে সে যে পথে চলে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো যা অতি নিকৃষ্ট স্থান। ﴾

[সূরা নিসা/১১৫]

এরপর ইমাম শাফেঈ (رحمه الله) বললেন,

لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض

যদি মুমিনদের অনুসরণ করা ফরজ না হতো তাদের বিরুদ্ধচারণ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হতো না।

একথা শুনে উক্ত বৃদ্ধ বলে আপনি সত্য বলেছেন।

[মিফতাহুল জান্নাহ্]

বর্তমানে এমন বহু লোক আছে যারা ইজমাকে অকাট্য দলীল হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের এই অস্বীকৃতির ফলাফল কতটা ভয়াবহ সে সম্পর্কে

তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইজমাকে অস্বীকার করলে শরীয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়। আমাদের হাতে এখন যে কোরআন রয়েছে এটিই যে আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হওয়া কোরআন এটা আমরা ইজমার মাধ্যমেই জানতে পারি। ইজমাকে অস্বীকার করলে একজন ব্যাক্তির অন্তরে এ বিষয়ে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় দানা বেধে উঠতে পারে। একইভাবে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস সমূহ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

ইমাম নাব্বী (ﷺ) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما

﴿ এই দুটি কিতাব সহীহ হওয়ার এবং এতে যেসব হাদীস আছে তার উপর আমল করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের আলেমরা ইজমা করেছেন। ﴾

[তাহ্যীব আল আসমা]

ইজমাকে অস্বীকার করলে একজন ব্যাক্তি গভীর সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে যেখান থেকে পরিত্রান পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একজন গবেষক যদি ইজমাকে উপেক্ষা করে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন তবে তার আকীদা বিশ্বাস এতটাই বিকৃত ও বিভ্রান্ত হবে যে বহুকাল যাবত তার অবস্থা থেকে মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করবে। কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে সঠিক পথে কেবল সেই ব্যাক্তিই চলতে পারবে যে ইজমাকে অকাট্য দলীল মনে করবে এবং যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইজমার বিরুদ্ধে যায় তা পরিত্যাগ করবে। যদি কোরআনের কোনো আয়াত বা আল্লাহর রসুলের কোনো হাদীস থেকে আমাদের এমন কিছু বুঝে আসে যা সাহাবায়ে কিরাম বা তাদের নিকটবর্তীযুগের ওলামায়ে কিরামের ইজমার বিপরীত তবে আমাদের বুঝতে হবে উক্ত আয়াতটির ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে যা আমরা জানি না কিন্তু তারা জানতেন [যেমনটি উমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেছেন]। অথবা আমাদের ধরে নিতে হবে উক্ত আয়াত বা হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে এবং যে দলীলের মাধ্যমে মানসুখ হয়েছে তা আমাদের নিকট

পৌছায় নি। ইমাম নাব্বী বলেন,

ومنها ما يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ ولاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم

«কখনও কখনও ইজমার মাধ্যমে শরীয়তের কোনো বিধান মানসুখ হওয়ার ব্যাপারটি জানা যায়। যেমন মদপায়ীকে চতুর্থবারে হত্যা করার বিধানটি [আবু দাউদ বর্ণিত] মানসুখ হয়ে গেছে। ইজমার মাধ্যমে এটার মানসুখ হওয়ার বিষয়টি জানা গেছে। ইজমা শরীয়তের কোনো বিধানকে মানসুখ করে না তবে ইজমার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বিধানটি মানসুখ করার মতো কোনো দলীল নিশ্চয় আছে।»

[শারহে মুসলিম]

বাদরুদ্দীন আল আয়নী বলেন,

وقال المحب الطبري وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر والله أعلم

[তাওয়াফ সংক্রান্ত আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাপারে] ইবনে জারীর তাবারী বলেন এই হাদীসটির উপর কেউ আমল করেছেন বলে আমি জানি না। যদি এমনটাই হয়ে থাকে তবে হাদীসটি মানসুখ। ইজমা যদিও কোনো কিছু মানসুখ করে না কিন্তু ইজামার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে উক্ত বিধানটি অন্য কেনো বিধান দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। যদিও সে বিধানটি আমাদের নিকট না পৌছায়।

[উমদাতুল কারী]

সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালেহীনদের যুগে যেসব ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে বর্তমানে কোনোভাবেই তা বাতিল করা যাবে না। যদি কোনো আয়াত বা হাদীস হতে ইজমার বিপরীত অর্থ বুঝে আসে তবে ধরে নিতে হবে আমরা সেটা সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না বা ওটি মানসুখ কিন্তু কোনো ক্রমেই সালফে সালেহীনদের ঐক্যমত হতে সরে এসে নিজের বুঝ অনুযায়ী আমল করা যাবে না।

**[২] বিরল মত বর্জন করা।**

এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত সম্পাদিত হয়নি কিন্তু সে বিষয়ে বিপরীত মতের আলেমদের সংখ্যা খুবই কম। এই সব মতামতকে বলা হয় শায (شاذ) বা বিরল মত। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের নীতি ছিল সর্বদা বিরল মত পরিত্যাগ করে চলা। কোনো মত শুধু শায বা বিরল হওয়ার কারণেই তারা এটির নিন্দা করতেন এবং তা হতে মানুষকে সতর্ক করতেন।

পূরুষদের জন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করা হারাম এ সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]

﴿এবং তোমাদের স্ত্রীদের ঐ সকল মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে লালিত পালিত হয়।﴾

[সূরা নিসা/২৩]

এখানে স্ত্রীর অন্য পক্ষের যে মেয়ে পরবর্তী স্বামীর গৃহে পালিত হয় তাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে পরবর্তী স্বামীর গৃহে পালিত নয় এমন মেয়ে বিবাহ করা বৈধ। সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে

এ বিষয়ে মতপার্থক্য চলে আসছে। কেউ কেউ আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী স্বামীর গৃহে পালিত নয় এমন কন্যাকে বিবাহ করা বৈধ মনে করেছেন। আলী (رضي الله عنه) এই মত গ্রহণ করেছিলেন বলে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। পরবর্তী আলেমদের মধ্যে দাউদ আজ-জাহিরী, ইবনে হিযাম ইত্যাদি আলেমরা এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আলেম এই মতটি গ্রহণ করেন নি। ইবনে হাযার আল-আসকালানী এই মতটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন,

وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ الْحَادِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَنُدْرَةُ الْمُخَالِفِ لَكَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّحْرِيمَ جَاءَ مَشْرُوطًا بِأَمْرَيْنِ أَنْ تَكُونَ فِي الْحِجْرِ وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يُرِيدُ التَّزْوِيجَ قَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ فَلَا تَحْرُمُ بِوُجُودِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ

﴿ যদি এ বিষয়ে পরবর্তীতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হতো এবং এবিষয়ে দ্বিমত পোষণকারীদের সংখ্যা বিরল না হতো তবে [কোলে পালিত নয় এমন কন্যা হারাম না হওয়ার মতটি] গ্রহণ করাই বেশি সঠিক হতো। ﴾

[ফাতহুল বারী]

দেখা যাচ্ছে দলীল প্রমাণের দিক হতে একটি মত শক্ত মনে হওয়ার পরও কেবল বিরল মত হওয়ার কারণে সেটি পরিত্যাগ করা হচ্ছে।

ইশার সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

এশার ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত।

[মুসলিম]

শাফেঈ মাযহাবের আলেম আল-ইস্খিারী ও অন্যান্য কিছু আলেম এই হাদীসের উপর নির্ভর করে বলেছেন অর্ধরাতের পর এশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। যদি কোনো অমুসলিম অর্ধরাতের পর মুসলিম হয় বা হায়েজগ্রস্থ মহিলা পবিত্র হয় তবে এই মতে তাকে সলাত আদায় করতে হবে না। কিন্তু এই মতটি বিরল। জমহুর আলেমের মতে এশার ওয়াক্ত ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে তবে অর্ধরাতের আগেই তা পড়ে নেওয়া উচিৎ। এই মতে একজন ব্যাক্তি অর্ধরাতের পর মুসলিম হলে বা কোনো

হায়েজগ্রস্থ মহিলা পবিত্র হলে সে এশার সালাত আদায় করবে। ইবনে হাযার আল আসকালানী বলেন,

وَلَمْ أَرَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا صَرِيحًا يَثْبُتُ

﴾ এশার সলাতের ওয়াক্ত ফজরের আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট সহীহ হাদীস আমি পায় নি। ﴿

[ফাতহুল বারী]

এখন আমাদের করনীয় কি হবে? এর উত্তর হলো আমাদের বিরল মত পরিত্যাগ করতে হবে এবং জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতকে গ্রহণ করতে হবে।

একইভাবে মিরাছের সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

[النساء: ١٧٦]

﴾ যদি কোনো ব্যাক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্

ান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে তবে সেই বোন পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। ﴾

[নিসা/১৭৬]

আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যার সন্তান নেই তার ভাই-বোন তার ওয়ারিছ হবে কিন্তু সামান্য কিছু মতপার্থক্য ছাড়া সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে ভাই-বোন দের ওয়ারিছ হওয়ার জন্য সন্তান ও পিতা উভয়ই বিদ্যমান না থাকা শর্ত। এ ক্ষেত্রেও আমাদের জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতামতকে অনুসরণ করতে হবে। এরকম আরা বহু উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

**[৩] ইখতিলাফী মাসয়ালাতে সহনশীল হওয়াঃ**

উপরে আমরা ইজমা ও বিরল মত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যেসব ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন সেটাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা শরীয়তের অকাট্য দলীল যার বিরোধিতা করার সুযোগ নেই। সেসব বিষয়ে ইজমা সম্পাদিত না হলেও বহু সংখ্যক আলেম একমত হয়েছেন এবং খুবই নগণ্য সংখ্যক আলেম ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেইসব বিষয়েও

জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতকে গ্রহণ করতে হবে এবং শায বা বিরল মতকে পরিত্যাগ করতে হবে। উপরের দুটি পয়েন্টে আমরা এসব বিষয়েই আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো ইখতিলাফী মাসয়ালা-মাসাইল সম্পর্কে। যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য খুবই প্রকট এবং উভয় পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বিদ্যমান থাকেন ঐ সকল মাসয়ালাকে ইখতিলাফী মাসয়াল-মাসাইল বলা হয়। সালফে সালেহীনদের মতামত ও কার্যপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখবো তারা যেমন কিছু বিষয়ে একমত হয়েছেন তেমনি কিছু বিষয়ে দ্বিমত করেছেন। তারা সেসব বিষয়ে একমত হয়েছেন সেগুলো আমরা বিনা বাক্যে গ্রহণ করবো আর যেসব বিষয়ে দ্বিমত করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে নিম্মোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবো,

**[ক]** আমরা এটা বিশ্বাস করি যে শরীয়তের বিধিবিধানের উপর চিন্া গবেষণা করতে যেয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনরা বিনা কারণে মতপার্থক্য করেছেন এমন নয় বরং গ্রহণযোগ্য কারণেই

মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েছেন। অনেকে আছে মতপার্থক্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তাদের কথা হলো কোরআন-হাদীস বিদ্যমান থাকতে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়ার কারণে তারা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামকে নিন্দা ও তিরষ্কার করে থাকে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের জবাব দিয়ে একটি বই লিখেছেন যার নাম দিয়েছেন ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام) অর্থাৎ "মহান ইমামদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব"। সেখানে তিনি আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه

«যদি সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে কোনো ইমামের কথা পাওয়া যায় তবে এটা জানতে হবে যে অবশ্যই উক্ত হাদীসটি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল।»

সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার ব্যাপারে

গ্রহণযোগ্য কারণ কি হতে পারে এসম্পর্কে তিনি বলেন,

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة

«এ বিষয়ে সকল কারণ তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত হয়তো তিনি মনেই করেন না যে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই কথা বলেছেন [অর্থাৎ তার নিকট হাদীসটি সহীহ সনদে পৌছায়নি বা তিনি হাদীসটির সনদকে সহীহ মনে করেন নি]। দ্বিতীয়ত উক্ত হাদীস হতে অন্যরা যা বুঝেছেন তিনি তা বোঝেন নি। তৃতীয়ত তিনি হাদীসটি মানসুখ মনে করেছেন। এই তিনটি প্রকার আবার বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়।»

ইবনে তাইমিয়ার কথার উপর সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই বোঝা যাবে যে, তিনি বলতে চাচ্ছেন কখনও কখনও মতপার্থক্য হয় এক পক্ষের নিকট হাদীস না পৌছানোর কারণে বা এক পক্ষ হাদীসটিকে সহীহ মনে

না করার কারণে। আবার কখনও কখনও উভয় পক্ষ হাদীসটি সহীহ মনে করার পরও সেটার অর্থ কি হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েন। সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) এর জীবনীতেও এমন প্রচুর কাহিনী পাওয়া যায় যেখানে তারা কোরআনের আয়াত ও রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মুখ নিঃস্বরিত বাণী সরাসরি শ্রবন করার পরও সেটার অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েছেন। আমরা নিচে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

**[একঃ]** আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কিরামকে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

«কেউ যেনো বনু কুরাইজাতে না পৌছে আসরের সলাত না পড়ে।»

[সহীহ বুখারী]

পরবর্তীতে বানু কুরাইজাতে পৌছানোর পূর্বেই আসরের সলাতের সময় হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েন।

একদল বলেন আমরা আল্লাহর রসুল যা নির্দেশ করেছেন হুবহু তাই পালন করবো ফলে তারা সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বনু-কুরাইজাতে পৌছে সলাত আদায় করেন। অন্য দল বলেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না বরং তিনি বলতে চেয়েছেন দ্রুত যাও। তারা রাস্তার ভিতরই সালাত আদায় করে নেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে এই ঘটনা বলা হলে তিনি কাউকেই তিরষ্কার করলেন না।

দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা সরাসরি শুনা ও জানার পরও সেটার উদ্দেশ্য ও অর্থ নিয়ে একনিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েছেন।

**[দুইঃ]** বুখারী শরীফে আবু মূসা আল আশয়ারী (رضي الله عنه) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর মধ্যে একটি মতপার্থক্যের কথা বর্ণিত আছে। এটি ছিলো জুনুবী অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা বৈধ কিনা এ সম্পর্কে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এটার বিপক্ষে ছিলেন। আবু মূসা আল-আশয়ারী (رضي الله عنه) বললেন,

فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: كَانَ يَكْفِيكَ

﴾ রসুলুল্লাহ (ﷺ) আম্মারকে বলেছিলেন [জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করা] তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। আপনি এটার ব্যাপারে কি করবেন? ﴿

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বললেন,

أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ

﴾ তুমি কি দেখনি যে উমর (رضي الله عنه) হাদীসটি গ্রহণ করেন নি? ﴿

আবু মূসা আল-আশয়ারী বললেন,

فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ

﴾ ঠিক আছে, আম্মারের হাদীসটি বাদ দিন। আপনি এ আয়াতটির ব্যাপারে কি করবেন? ﴿

এরপর তিনি সূরা মায়েদার ছয় নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন যেখানে স্ত্রী সহবাসের পর পানি না পেলে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাবী বলেন,

مَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الماءُ أَنْ يَدَعَهُ

﴿ এর পর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি কি বলবেন। তিনি বললেন যদি আমরা মানুষকে এই সুযোগ দিই তবে আশঙ্কা রয়েছে যে তাদের কারো নিকট পানি একটু ঠাণ্ডা মনে হয় তারা তা পরিত্যাগ করে তায়াম্মুম করবে। ﴾

[সহীহ বুখারী]

এখানে দেখা যাচ্ছে কোরআনের আয়াত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দুজন সাহাবীর মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। উমর (ﷺ) ইবনে মাসউদের মতই জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম না করার পক্ষে ছিলেন। তাদের এই মত বর্তমানে পরিত্যাজ্য হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখার বিষয় শুধু এতটুকু যে একটি স্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান থাকতেও উমর (ﷺ) ও ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর মতো বরেণ্য সাহাবী কিভাবে তার বিপরীত ফতওয়া দিতে পারেন! কোনো ভাবেই একথা বলা যায় না যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধচারণ

করেছেন বরং প্রকৃত কথা হলো তারা বুঝতে ভুল করেছেন। বোঝা যাচ্ছে কোরআনের আয়াত বা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস বুঝতে যেয়ে এমনকি স্পষ্ট ব্যাপারেও দ্বিমত হতে পারে।

**[তিনঃ]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পক্ষ হতে নির্দেশ ছিলো, কোনো মুসলিম যুদ্ধে যে কাফিরকে হত্যা করবে তাকে উক্ত কাফিরের যাবতীয় সম্পদ প্রদান করা হবে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে আমীর নিয়োগ করে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ঐ অভিযানে এক মুসলিম একজন কাফিরকে হত্যা করেন যার সাথে বিপুল পরিমান সম্পদ ছিলো। খালিদ (رضي الله عنه) উক্ত মুসলিমকে নিহত কাফিরের পরিত্যাক্ত সম্পদ দিতে অস্বীকার করলে আওফ ইবনে মালিক নামক আরেক সাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন,

يَا خَالِدُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

﴿ হে খালিদ তুমি কি জানো না যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিহত কাফিরের সম্পদ যে তাকে হত্যা করে তাকে প্রদান করতে বলেছেন? ﴾

খালিদ (ﷺ) বলেন,

بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ

﴿ হ্যা। কিন্তু আমার নিকট এটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে। ﴾

পরে এ সংবাদ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট পৌছালে তিনি বলেন,

مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟

﴿ তুমি কেনো তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করো নি? ﴾

খালিদ (ﷺ) বলেন,

اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ،

﴿ হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) আমার নিকট ওটা অনেক বেশি মনে হয়েছে। ﴾

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

«ادْفَعْهُ إِلَيْهِ»

﴿ ঐ সম্পদ তাকে দিয়ে দাও। ﴾

পরবর্তীতে আওফ ইবনে মালিক খালিদ (ﷺ) এর চাদর টেনে ধরে বলেন,

هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ

﴾ আমি যা বললাম তাই হলো তো? ﴿

তার কথা শুনে রসুলুল্লাহ (ﷺ) রেগে গিয়ে বললেন,

لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟

﴾ খালিদ তুমি তাকে দিয়ো না তুমি তাকে দিয়ো না তোমরা কি আমার আমীরদের সাথে সদাচরণ করবে না? ﴿

সম্পূর্ণ ঘটনাটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে নিহত কাফিরের সম্পদ হত্যাকারী মুসলিমকে প্রদান করার ব্যাপারটি খালিদ (ﷺ) এর জানা ছিল কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন সম্পদ অনেক বেশি হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট তিনি তার যুক্তি পেশ করেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন তুমি তাকে তার সম্পদ দিয়ে দাও কিন্তু তিনি তাকে তিরষ্কার করলেন না। বোঝা গেলো এ

বিষয়ে খালিদ (ﷺ) এর ইজতিহাদ ভুল ছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ্যতা করেন নি। পরবর্তীতে খালিদ (ﷺ) এর পক্ষ নিয়ে আওফ ইবনে মালিকের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার ঘটনাও প্রমাণ করে যে রসুলুল্লাহ (ﷺ) খালিদ (ﷺ) কে তার নির্দেশ অমান্য করার কারণে অবাধ্য ও অপরাধী মনে করেননি। কেননা তেমন হলে তিনি খালিদ (ﷺ) এর উপরই রাগান্বিত হতেন আওফ ইবনে মালিকের প্রতি নয়।

এই হাদীসেও দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নির্দেশ জানা থাকা স্বত্ত্বেও দুজন সাহাবী দুরকম বুঝেছেন।

**[চারঃ]** রসুলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বললেন,

ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ

«আমার নিকট একটি কাগজ নিয়ে এসো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এমন একটি বিষয় লিখে যেতে চাই যার ফলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।» [সহীহ বুখারী]

উমর (ﷺ) বললেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ

﴾ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এখন মারত্মকভাবে অসুস্থ আর আমাদের নিকট তো আল্লাহর কিতাব রয়েছেই সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ﴿

অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) বললেন,

قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ

﴾ দ্রুত নিয়ে এসো, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এমন কিছু লিখবেন যার ফলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। ﴿

এর ফলে ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলো হাদীসটির শেষে এসেছে,

فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي»

﴾ যখন তারা উঁচু স্বরে কথা শুরু করলো এবং ব্যাপক মতপার্থক্যে লিপ্ত হলো তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

এখান থেকে উঠে যাও। ﴾

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে হাজার (رحمه الله) বলেন,

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ ائْتُونِي أَمْرٌ وَكَانَ حَقُّ الْمَأْمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَحِ فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ

﴿ ইমাম আল-কুরতুবী ও অন্যান্য আলেমরা বলেছেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা "নিয়ে এসো" (ائتوني) এটা আদেশ। যাদের আদেশ করা হচ্ছিল তাদের উচিৎ ছিলো যত দ্রুত স্বম্ভব আদেশ পালনের চেষ্টা করা কিন্তু উমর (رضي الله عنه) ও অন্য কিছু সাহাবা মনে করেছিলেন এই আদেশটি বাধ্যতামুলক আদেশ নয় বরং রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রতি দয়া পরবশ এটা করতে চাচ্ছেন। এ কারণে তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে কষ্ট দিতে চাননি। ﴾ [ফাতহুল বারী]

ইমাম আন-নাব্বী (رحمه الله) বলেন,

وَأَمَّا كَلَامُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فِقْهِ عُمَرَ وَفَضَائِلِهِ وَدَقِيقِ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكْتُبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا وَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا فَقَالَ عُمَرُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

❖ আর উমর (رضي الله عنه) এর কথাটির ব্যাপারে কথা হলো যেসব আলেমরা এই হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন তারা সকলে একমত হয়েছেন যে উমর (رضي الله عنه) এর এই কথাটি তার গভীর বুঝ ও সুক্ষ বিচার বুদ্ধির প্রমান বহন করে। যেহেতু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে হয়তো রসুলুল্লাহ (ﷺ) এমন কিছু লিখবেন যা পালন করতে মানুষ অপারগ হয়ে যাবে ..... ❖ [শারহে মুসলিম]

ঘটনা যাই হোক উমর (رضي الله عنه) হাদীসটি হতে বাধ্যতামূলক আদেশ বোঝেন নি তেমন মনে করলে তিনি অবশ্যই রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করতেন না। দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আদেশ সরাসরি শোনার পরও অনেকের নিকট ভিন্ন অর্থ মনে হতে পারে।

**[পাঁচঃ]** সালিম নামে এক যুবক হুযাইফা (رضي الله عنه) এর ঘরে লালিত পালিত হয়। সে বড় হওয়ার পরও হুযাইফা (رضي الله عنه) এর স্ত্রীর সামনে অবাধে যাওয়া আসা করতো। হুযাইফা (رضي الله عنه) এটা অপছন্দ করতেন। উক্ত মহিলা (رضي الله عنها) রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে সব খুলে বললে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেন,

أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ

﴿ তুমি তাকে দুধ পান করাও যাতে তুমিও তার উপর হারাম হয়ে যাও আর হুযাইফার অন্তরের অসন্তুষ্টিও দূর হয়ে যায়। ﴾

এর পর উক্ত মহিলা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ মোতাবেক উক্ত যুবককে দুধ পান করায় [আলেমরা বলেছেন দুধ বের করে বাটিতে নিয়ে তাকে পান করানো হয়েছিল]।

এই হাদীস অনুযায়ী আয়েশা (رضي الله عنها) ফতওয়া দিতেন ছোট বড় যে কাউকে দুধ পান করালে সে উক্ত মহিলার দুধ পুত্র হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু উম্মে সালমা (رضي الله عنها) বলেন,

أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রীরা সকলে এই ধরণের দুধ পানের মাধ্যমে কাউকে তাদের সামনে প্রবেশ করাতে অস্বীকার করেছেন তারা আয়েশা (رضي الله عنها) কে বলেছেন আল্লাহর কসম আমরা তো মনে করি যে এটা সালিমের জন্য বিশেষ একটি ছাড় যা রসুলুল্লাহ (ﷺ) খাছভাবে তাকে দিয়েছেন। অতএব এই ধরণের দুধ পানের মাধ্যমে কেউ আমাদের সামনে প্রবেশ করতে বা আমাদের দর্শন করতে পারবে না।

[সহীহ মুসলিম]

জমহুর ওলমায়ে কিরাম এই বিষয়ে আয়েশা (رضي الله عنها) এর মত পরিত্যাগ করেছেন। তারা একমত হয়েছেন যে দুই বছরের বেশি বয়সের কাউকে দুধ পান করানো হলে সে দুধপুত্র বলে গণ্য হয় বা এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিধান প্রমানিত হয় না।

এখানে দেখা যাচ্ছে আয়েশা (رضي الله عنها) এর পক্ষে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান ছিল কিন্তু রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রীরা এটাকে খাছভাবে শুধুমাত্র সালিমের উপর প্রযোজ্য মনে করেছেন আর আয়েশা (رضي الله عنها) আমভাবে সবার উপর প্রযোজ্য মনে করেছেন।

এভাবে আবু যার (رضي الله عنه) এর সাথে জমহুর সাহাবায়ে কিরামের যাকাত ও কানয এর ব্যাপারে মতপার্থক্য। সাহরীর সময় কালো সুতা ও সাদা সুতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত ইত্যাদি প্রচুর ঘটনাকে এই বিষয়ের উপর দলীল হিসাবে উপস্থাপণ করা যায় এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু এতটুকু প্রমাণ করতে চাই যে, কোরআন-হাদীসের উপর গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় দুজন অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন আলেম মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এমনকি কখনও কখনও স্পষ্ট বিষয়েও দ্বিমত হতে পারে যেমন হয়েছে তায়াম্মুমের মাসয়ালাতে জমহুর সাহাবায়ে কিরামের সাথে উমর (رضي الله عنه) ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর এবং যাকাতের মাসয়ালাতে আবু যার (رضي الله عنه) এর। এতদূর জেনে নেওয়ার পর আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে,

নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলেই কোনো আলেমকে তিরস্কার করা সঠিক নয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

«যখন একজন বিচারক ইজতিহাদ করে রায় দেয় তখন যদি তার রায় সঠিক হয় তবে তিনি দুটি পুরষ্কার পান আর যদি তার রায় ভুল হয় তবে একটি পুরষ্কার প্রাপ্ত হন।»

সুতরাং ইখতিলাফী মাসয়ালাতে একে অপরকে তিরস্কার না করে পরস্পরকে পুরষ্কার প্রাপ্ত মনে করতে হবে। যতক্ষণ না কেউ ইজমার বিরুদ্ধে মতামত দেয় বা তার বেশিরভাগ মতামত জমহুর আলেমের বিরুদ্ধে যায়। সেক্ষেত্রে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে তার থেকে সতর্ক করতে হবে। আর আল্লাহই ভাল জানে।

**[খ]** যেসব মাসয়ালাতে একাধিক মত বিদ্যমান থাকে এবং উভয় পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফুকাহা ও মুজতাহিদীনদের মত পাওয়া যায় একজন যোগ্যতা

সম্পন্ন গবেষক ঐ সকল মাস্‌য়ালাতে চিন্া গবেষণা করে যেটিকে অধিক সঠিক মনে হবে সেটির উপর আমল করবেন এবং সেটির উপর ফতওয়া দেবেন কিন্তু তিনি ভিন্নমতালম্বীদের উপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে পারবেন না। নিজের মতকে তিনি সঠিক মনে করতে পারেন কিন্তু অন্যকে পথভ্রষ্ট মনে করার অধিকার তার নেই।

ইমাম নাব্বী (رحمه الله) বলেন,

ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ

«আলেমরাও মানুষকে কেবল সেই সব বিষয় হতে নিষেধ করবেন সেসব ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে আর যেসব বিষয়ে দ্বিমত আছে সেসব ব্যাপারে কাউকে নিষেধ করা যাবে না।» [শারহে মুসলিম]

এবিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ

উমর ইবনে আব্দিল আজীজ বলতেন, আমি এমন মনে করি না যে, সাহাবায়ে কিরাম কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত না হলেই ভাল হতো কেননা যখন তারা কোনো বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করে তখন তাদের মতের বিরুদ্ধে কেউ গেলে অপরাধী হয় আর যখন তারা দ্বিমত করেন তখন তাদের মতামতসমূহের মধ্যে যে কোনোটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। [মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

তিনি আরো বলেন,

وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ

«একারণে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো সাহাবায়ে কিরামের ইজমা অকাট্য দলীল আর তাদের ইখতিলাফ প্রশস্ত রহমত।»

[মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেন,

لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْه

একজন আলেমের এই অধিকার নেই যে মানুষকে তার মত মেনে চলতে বাধ্য করবে। একারণে শাফেঈ মাযহাবের ও অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের মধ্যে যারা আল-আমরু বিলমা'রুফ ওয়ান-নাহী আনিল মুনকার [সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ] সম্পর্কে বই রচনা করেছেন তারা বলেছেন এই সকল ইজতিহাদী মাসয়ালাতে কোনো শক্তির প্রয়োগ করে কাউকে নিষেধ করা যাবে না। কারো এই অধিকার নেই যে, অন্যকে নিজের মত মানতে বাধ্য করবে।

বরং সে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করবে তার আলোচনার মাধ্যমে যদি কারো নিকট কোনো একটি মত সঠিক বলে মনে হয় তবে সে তার অনুসরণ করবে আর যদি কেউ অন্য মতটির তাকলীদ করে তবে তাকে নিন্দা করা যাবে না। ﴾

[মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

কিছু লোক আছেন সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন ইখতিলাফী বিষয়ের দা'ওয়াত দেয়। সলাতের ভিতর রুকুর আগে পরে হাত তোলা, আমীন জোরে বলা, সুরা ফাতিহা পড়া ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে প্রচার করে যে মনে হয় এগুলো ছাড়া কেউ মুসলিমই হতে পারে না। তাদের বুঝতে হবে যে এসব ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেই মতপার্থক্য ছিলো কিন্তু তারা এগুলো নিয়ে বাক-বিতণ্ডাতে লিপ্ত হন নি।

**[৪] সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ বৈধ মনে করাঃ**

তাকলীদ (تقليد) অর্থ কোনো মাসয়ালাতে নিজে দলীল না জেনে কোনো বিশ্বস্ আলেমের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিছু অজ্ঞ লোক বলে থাকে তাকলীদ অর্থ অন্ধ

আনুগত্য। আমি যে বিষয়ে জানি না সে বিষয়ে একজন আস্থাভাজন অভিজ্ঞ ব্যাক্তির কথা মেনে চলাকে কিভাবে অন্ধ আনুগত্য বলা যেতে পারে! রোগী ডাক্তারের পরামর্শে ঔষোধ সেবন করে, এটাকে কি অন্ধ আনগত্য বলা যায়! অন্ধ আনুগত্য তো তখন বলা যাবে যখন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে পরিত্যাগ করে গ্রাম্য কবিরাজের নিকট চিকিৎসা নেওয়া হবে। কোরআন-হাদীস হতে জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেসব যোগ্যতার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেগুলোর আলোকে চিন্া গবেষণা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে সকল মুসলিম কোরআন-হাদীস হতে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম নন। কিন্তু মুসলিম হওয়ার পর হতেই দৈনন্দিন জীবনে তাদের সলাত, সওম, ইত্যাদি ইবাদত পালন করতে হয়। যদি কোনো আলেমের ফতওয়া বা মাসয়ালা অনুযায়ী আমল করা হারাম হিসাবে গণ্য হয় তাহলে এই ব্যাক্তি কি করবে? প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট লোকেরাই এই ধরণের কথা বলে থাকে। তারা আল্লাহর কোরআনের এমন কিছু আয়াত পেশ করে থাকে যেগুলোর সঠিক অর্থ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]

﴿যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে আমরা তো কেবল সেই জিনিসের অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ-দাদারা ছিলো। আপনি বলুন যদিও এমন হয় যে তোমাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝতো না এবং তারা সঠিক পথে ছিলো না?﴾ [বাকারা/১৭০]

এই সকল বোকা লোকেরা এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করাকে তুলনা করে। তাদের দৃষ্টিতে মুশরিক পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আর নেককার আস্থাভাজন পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের অনুসরণ একই পর্যায়ের [নাউযু বিল্লাহ]। একজন কৃষকের ছেলে যদি অসুস্থ হওয়ার পর বলে, আমার বাবা যে ঔষোধ খেতে বলে আমি তাই খাবো। আরেকজন বুদ্ধিমান লোক অসুস্থ হওয়ার পর যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট গমন করে বলে, আপনি যে ঔষোধ লিখবেন আমি আমি তাই সেবন করবো। এই দুটি অনুসরণ কি সমান

হলো?

ইমাম কুরতুবী (رحمه الله) বলেন,

تعلق قوم بهذه الاية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لابائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية.وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر

কিছু কিছু লোক এই আয়াত ব্যবহার করে তাকলীদের নিন্দা করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কাফিররা তাদের পূর্বপূরুষদের বাতিল চিন্া দর্শনের তাকলীদ করেছিলো এটার নিন্দা করেছেন। পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে এই নিন্দা ঠিকই আছে কিন্তু সত্যের ব্যাপারে কাউকে তাকলীদ করা দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্য একটি এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল। যারা গভীর চিন্া-ভাবনা করতে সক্ষম নয় তারা এটার উপর নির্ভর করে থাকে। [তাফসীরে কুরতুবী]

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন,

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]

﴿ জ্ঞান অর্জনের জন্য মুমিনরা সকলে বের হয়ে পড়বে এটা অসম্ভব। তবে তাদের মধ্যে প্রতিটি দল হতে কিছু লোক কেনো দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়ে যায় না যাতে করে তারা ফিরে এসে স্বীয় সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যার ফলে তারা সতর্ক হবে। ﴾ [সূরা তাওবা/১২২]

এই আয়াতে দুটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

**[ক]** সকল মুসলিমের পক্ষে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় কিন্তু প্রতিটি এলাকায় এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের নিয়োজিত করবে।

**[খ]** যারা জ্ঞান অর্জন করবেন অন্যান্যরা তাদের পথনির্দেশ অনুযায়ী আমল করবেন। উপরোক্ত আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]

﴿ যাতে তারা ফিরে এসে স্বীয় সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যার ফলে তারা সতর্ক হবে। ﴾ [সূরা তাওবা/১২২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]

﴿ তোমরা যদি না জানো তবে যারা জানে তাদের নিকট প্রশ্ন করো। ﴾

[নাহল/৪৩]

একদল সাহাবী অভিযানে বের হলে তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ ব্যাক্তির উপর গোসল ফরজ হয়। সে অন্যদের প্রশ্ন করে আমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ আছে কি? তারা বলেন, পানি থাকা অবস্থায় আমরা তোমার জন্য কোনো সুযোগ দেখছি না। ফলে ঐ ব্যাক্তি গোসল করেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়ে মারা যান। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই খবর শুনে বলেন,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

﴾ আল্লাহর কসম এরাই তাকে হত্যা করেছে। যদি তাদের জানা না থাকে তবে অন্যকে প্রশ্ন করলো না কোনো। যে জানে না তার সামাধান হলো প্রশ্ন করা। ﴿

[আবু-দাউদ, আলবানী হাসান বলেছেন]

নাসীহত বা কল্যাণ কামনার ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী বলেন,

وَأَنَّ مِنْ نَصِيحَتِهِمْ قَبُولُ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَإِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ

﴾ আলেমদের কল্যাণ কামনার মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে তারা যা বর্ণনা করেন তা গ্রহণ করা, মাসয়ালা মাসাইলের ব্যাপারে তাদের তাকলীদ করা, তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখা ইত্যাদি। ﴿ [শারহে মুসলিম]

যদি একজন ব্যাক্তি দাড়িয়ে বলে, আমি ইমাম বখারীকে চিনি না, ইমাম মুসলিমকে চিনি না। কে কোন হাদীস সহীহ বললো বা দূর্বল বললো এতে

আমার যায় আসে না আমি নিজে যতদিন না সহীহ-জঈফ পার্থক্য করতে পারি ততদিন কোনো হদীস মানতে বাধ্য নই। আমি কারো তাকলীদ করতে পারবো না। তবে এই ব্যাক্তির এই আচরণ কেমন হবে? এই ব্যাক্তির এই কথা ইমাম বুখারীর সারা জীবনের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া নয় কি? একইভাবে অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ফিকহী মতামতসমূহের ব্যাপারে যদি কেউ এই ধরণের নীতি অবলম্বন করে তবে সেটাও এই পর্যায়ের ধৃষ্টতা ও অবিচার বলে বিবেচিত হবে।

**তবে দুটি স্থানে তাকলীদ চরম ঘৃণিত অপরাধ হিসাবে পরিগনিত হবে।**

**[ক]** যে ব্যাক্তিকে আল্লাহ কোরান হাদীস বুঝা ও দ্বীনের গভীর বিষয় সমূহ অনুধাবন করার যোগ্যতা দিয়েছেন যদি এই ব্যাক্তি সত্য অনুধাবনের পরও তার বিপরীতে কোনো আলেম বা মুজতাহিদের কথা মেনে চলে তবে এটা মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]

﴿ তারা তাদের আলেম ও সন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। ﴾ [সূরা তাওবা/৩১]

ইবনে তাইমিয়া (رحمه الله) বলেন,

مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ إلَى عَادَتِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ

﴿ আল্লাহ (سبحانه وتعالى) তার রসুলকে যে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন সেটা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার পর যদি কেউ তা পরিত্যাগ করে প্রচলিত রীতিনীতিকে আকড়িয়ে ধরে থাকে তবে তার এই কাজ নিন্দনীয় ও শাস্যিযোগ্য অপরাধ বলে গন্য হবে। ﴾

[মাজমুউল ফাতাই]

এখানে সত্য স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া বলতে পূর্বে যা কিছু নিয়মনীতি বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে সত্য অনুধাবন করা বুঝতে হবে। একটি আয়াত বা একটি হাদীস পাঠ করার পর সেটার আলোকে সমস্ ওলামায়ে কিরামের মতামতকে পিছনে নিক্ষেপ করা নয়। সঠিক নীতিমালার আলোকে সত্য অনুধাবনের

পর সেটা পরিত্যাগ করে কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ করা সঠিক নয়।

**সতর্কতাঃ** এখানে একটি বিষয় অবশ্যই গুরুত্বর সাথে লক্ষ করতে হবে। কোরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত ও কর্মপন্থার উপর চিন্তা-গবেষণা করে যদি কোনো গবেষকের নিকট সত্য প্রকাশিত হয় এবং তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে এ বিষয়ে বিরোধীপক্ষ ভ্রান্তির উপর আছে তবে তার জন্য উক্ত সত্যের অনুসরণ করা ফরজ হবে। কিন্তু তিনি যে বিষয়টিকে স্পষ্ট সত্য মনে করছেন যদি একদল গ্রহণযোগ্য ও আস্থাশীল আলেম ওলামা সেই মতটির বিপরীতে রায় দিয়ে থাকেন এবং তাদের মতটি ইজমার বিরুদ্ধে না যায় বা বিরল না হয় তবে ঐ সকল আলেম ওলামাদের তিরষ্কার করা যাবে না। কারণ এটা অসম্ভব নয় যে আমার নিকট যে বিষয়টি স্পষ্ট সত্য বলে মনে হচ্ছে বিভিন্ন কারণে অন্য কারো নিকট সেটা ভিন্নরকম মনে হতে পারে। জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর সাথে আবু মূসা আল আশয়ারী (رضي الله عنه) এর আলোচনায় আমরা বিষয়টি লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি কারআনে

উল্লেখিত স্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে কিভাবে দুজন সাহাবীর মাঝে মতভেদ হয়েছে। এ বিষয়ে উমর (ﷺ) ও একই মতামত পোষণ করতেন। একথা বলা যায় না যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) বা উমর (ﷺ) ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছেন বা পাপ করেছেন। একইভাবে সম্পদ জমা করার ব্যাপারে আবু জর (ﷺ) এবং নিহত কাফিরের গনীমত হত্যাকারী মুসলিমকে দেওয়ার ব্যাপারে খালিদ (ﷺ) রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নির্দেশকে ভিন্নভাবে বুঝেছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাদের মত পরিত্যাগ করা হবে কিন্তু এমন বলা যাবে না যে তারা পাপী বা অপরাধী। কেননা একজনের নিকট যা স্পষ্ট মনে হচ্ছে অন্যজন সেটাকে স্পষ্ট মনে নাও করতে পারেন। একইভাবে একজন ফকীহ্ যে সত্য অনুধাবণ করেছেন এবং সেটা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন তিনি তার অধিনস্দের এবং সুভাকাঙ্খীদের সেটা মেনে চলতে আদেশ করবেন, মানুষের মাঝে সেটা প্রচার করবেন কিন্তু যদি কোনো সাধারন মুসলিম তার কথা পরিত্যাগ করে অন্য একদল আস্থাশীল আলেম যে ফতওয়া দিয়েছেন সেটার তাকলীদ করে তবে তাকে পথভ্রষ্ট বা

অপরাধী বলতে পারবেন না। কেননা সাধারন মানুষেরা তো দলীল প্রমানের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম নয়। কোরআন-হাদীসের উপর চিন্তা গবেষণা করে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা যে কোনো একজন আস্থাশীল আলেমের ফতওয়া অনুযায়ী চলবেন এটাই স্বাভাবিক। তারা যদি যাচায় বাছায় করে তাকওয়া ও জ্ঞানের মানদণ্ডে আস্থাভাজন প্রমানিত হয় এমন একজন আলেমের ফতওয়া মান্য করেন তবে উক্ত আলেমের ভুলের কারণে তাদের পাকড়াও করা হবে না। এমনটি যদি উক্ত আলেম ইচ্ছাকৃত ভুল ফতওয়া দেয় তবুও কেবল সে অপরাধী হবে যে তার নিকট ফতওয়া প্রার্থণা করলো সে নয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

❮ যখন কারো নিকট কেউ ফতওয়া চায় আর সে জ্ঞান ছাড়া ফতওয়া দেয় তবে তার পাপ যে ফতওয়া দিলো তার উপর বর্তাবে। ❯

[আবু দাউদঃ আলবানী হাসান বলেছেন]

আর যদি উক্ত আলেম সঠিক মূলনীতির উপর টিকে থেকে চিন্তা-গবেষণা বা ইজতিহাদ করে ফতওয়া দেন এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে নিপতিত হন তবে তিনিও যেমন দোষী হবেন না তার অনুসারীরাও দোষী হবে না। যদি না তিনি ইজামার বিরুদ্ধে রায় দেন বা কেরআন-হাদীস হতে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্বপবর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতকে উপেক্ষা করেন। সে ক্ষেত্রে তিন মারাত্মক অপরাধী হবেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জানার পর যারা তার অনুসরণ করবে তারাও দোষী হবে। কারণ এই ব্যাক্তির জ্ঞান অর্জনের পথ সঠিক নয়। এ বিষয়ে খারেজীদের উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করতে চেয়েছিল এমন নয় বরং কোরআন হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মতমতকে উপেক্ষা করার কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

**[খ]** যদি কোনো সাধারন মুসলিম এমন কোনো আলেমের ফতওয়া মেনে চলে যিনি জ্ঞান বা তাকওয়ার দিক হতে আস্থাশীল নন তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত সাধারন মুসলিম অপরাধী সাব্যস্ত হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

﴿ যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞ লোকদের নিজেদের নেতা বানিয়ে নেবে তারা তাদের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করবে আর তারা জ্ঞান ছাড়াই সেগুলোর উত্তর দেবে ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। ﴾ [সহীহ বুখারী]

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যিনি ভুল ফতওয়া দিচ্ছেন কেবল তিনি দোষী হচ্ছেন ফতওয়া প্রার্থী নয়। আর এই হাদীসে আমরা দেখছি যে ফতওয়া দিচ্ছে আর যে ফতওয়া অনুসারে আমল করছে উভয়ে দোষী সাব্যস্ হচ্ছে। এখানে পার্থক্য হলো প্রথম ক্ষেত্রে ফতওয়াপ্রার্থী চিন্া-গবেষণা করে যাকে যোগ্য ও আস্থাশীল মনে হয়েছে তার নিকট ফতওয়া প্রার্থণা করেছেন ফলে ভুল ভ্রান্তির ভার তার উপর অর্পিত হয়নি। কারণ তিনি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফতওয়াপ্রার্থী অজ্ঞ লোককে নিজের নেতা বানিয়েছে এবং তার নিকট ফতওয়া প্রার্থণা

করেছে ফলে ফতওয়া প্রার্থী ও ফতওয়া দাতা উভয়ে দোষী হয়েছে।

একজন মুসলিমের উপর দায়িত্ব হলো নিজের দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে এমন কারো নিকট শরানপন্ন হওয়া যিনি জ্ঞান ও তাকওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। যে সকল আলেম ওলামারা রাজা বাদশাদের দরবারে যাওয়া আসা করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ফতওয়া দিয়ে থাকে তাদের ফতওয়া অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে না। একইভাবে যে ব্যাক্তি ফতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক মূলনীতির অনুসরণ করে না যেমন ইজমা অস্বীকার করে বা বিরল মতের অনুসরণ করে তবে এই ব্যাক্তির ফতওয়াও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢١]

﴿তোমরা কেবল তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না এবং তারা সঠিক পথে আছে।﴾ [ইয়াসীন/২১]

একজন আলেমের দুটি গুন থাকতে হবে। প্রথমত

তাকে তাকওয়াবান হতে হবে যাতে দুনিয়ার লোভে রাজা-বাদশা বা ধনী ও প্রভাবশালীদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভুল ফতওয়া দেওয়ার আশঙ্কা না থাকে। দ্বিতীয়ত তাকে তাকওয়াবান হওয়ার সাথে সাথে ফতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক মূলনীতির অনুসরণ করতে হবে। তিনি যদি সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী আইম্মায়ে মুজতাহিদীনকে উপেক্ষা করে মতামত ব্যাক্ত করতে চান তবে তাকে অনুসরণ করা যাবে না যেহেতু তিনি নিজেই একজন বিদয়াতী এবং তার মতামত কেবল নতুন নতুন বিদয়াত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

## [৫] চার মাযহাবের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হওয়াঃ

মাযহাব (مذهب) অর্থ পথ বা মত। বর্তমানে আমরা মাযহাব বলতে ফুকাহায়ে কিরামের চারটি পথ ও পদ্ধতিকে বুঝে থাকি। হানাফী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, শাফেঈ মাযহাব ও হাম্লী মাযাহাব। চারজন মহান ইমামের নামের সাথে মিল রেখে চার মাযহাবের নাম করণ করা হয়েছে যাদের প্রত্যেকে আমাদের নিকট সুপরিচিত। এই সকল মহান ইমামদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর হতে যত আলেম-ওলামা,

মুহাদ্দিস-মুফাসসির জন্ম নিয়েছেন তাদের সবাইকে কোনো না কোনো মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয় আবু বকর আল-জাস্সাস আল-হানাফী, ইমাম নাব্বী আশ-শাফেঈ, ইবনে কুদামা আল-হাম্বালী, ইবনে আরবী আল-মালিকী ইত্যাদি। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই ধরণের পরিচয়কে অপছন্দ করেননি। শুধু তাই নয় বরং অল্প কিছু আলেম ছাড়া অন্য সবায় নিজেদের কোনো না কোনো মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করতেন।

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলাবী (رحمه الله) বলেন,

أن هذه المذاهب الاربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها علي جواز تقليدها إلي يومنا هذا وفي ذالك من المصالح ما لا يحصي لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم واشربت النفوس الهوي واعجب كل ذي رأي برأيه

বর্তমান সময় পর্যন্ত উম্মতের আলেমরা সকলে বা তাদের মধ্যে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য তারা একমত যে এই চারটি মাযহাব যা কিতাবে লিখিত রয়েছে এগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটির অনুসরণ করা

যেতে পারে। এতে যা উপকারীতা আছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন মানুষের ইজতিহাদ করার শক্তি কমে এসেছে এবং নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকে তার মতকে সঠিক মনে করছে। [আল ইনসাফ]

সুতরাং চার মাযহাবের যে কোনো একটিকে অনুসরণ করা এবং এগুলোর সাথে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করা ইত্যাদি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু বর্তমানে কিছু লোক এ ধরণের পরিচয়কে অপছন্দ করছে তাদের কেউ কেউ মযাহাবী পরিচয়কে হারাম এমনকি শিরক কুফর পর্যন্ত বলছে। তারা এবিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগ উপস্থাপণ করে থাকে। আমরা তাদের আপত্তি অভিযোগসমূহ উল্লেখপূর্বক সেগুলোর খণ্ডায়ণ করবো ইনশাআল্লাহ।

**[ক] কোনো মাযহাবের অনুসরণ করা অর্থ কোরআন হাদীসের পরিবর্তে উক্ত মাযহাবের ইমামকে অন্ধঅনুসরণ করা !!!**

এরা মনে করে হানাফী মাযহাব বলতে বোঝায় ছোট বড় সব বিষয়ে ইমাম আবু হানীফাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা। একইভাবে অন্যান্য মাযহাবের ব্যাপারে তাদের ধারণা হলো উক্ত মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিরা কোনোরুপ বাছ-বিচার না করে ঐ মাযহাবের ইমামকে প্রতিটি ব্যাপারে অনুসরণ করে থাকেন। তাদের এই ধারণ সম্পূর্ণ ভূল বরং প্রকৃত সত্য হলো প্রতিটি মাযহাবে যুগের পর যুগ শত-সহস্র আলেম ওলামা গত হয়েছেন। তারা ইজতিহাদ ও চিন্া গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের মাযহাবের মতামত সমহ বিভিন্ন কিতাবে গ্রন্থিত করেছেন। যে সকল মত দূর্বল মনে করেছেন সেগুলো বাতিল করেছেন। এক মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম অন্য মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের সাথে আলোচনা করেছেন। একজন আরেকজনের দলীল প্রমানগুলো বুঝার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম তাদের কিতাবে অন্যান্য মাযহাবের মতামত উল্লেখ পূর্বক সেগুলোর দলীল প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, খণ্ডায়নের চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো মাসয়ালাতে বিরোধী পক্ষের দলীল শক্ত বলে মনে হলে তা স্বীকার

করেছেন এবং সেটি গ্রহণ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের আলেম ইবনে কুদামার আল মুগনী, মালেকী মাযহাবের আলেম আল কুরতুবীর লেখা তাফসীরে কুরতুবী এবং ইবনে আরাবীর আহকামুল কুরআন, শাফেঈ মাযহাবরে আলেম ইবনে হাযারের ফাতহুল বারী ও ইমাম নাব্বীর শারহে মুহায্যাব, হানাফী মাযহাবের আলেম বাদরুদ্দীন আইনীর উমদাতুল কারী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমান। এই ধরণের সুক্ষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের কারণে চার মাযহাবের ভিতর যেসব ফতওয়া বর্তমানে টিকে আছে সেগুলো ইজমার বিপরীত বা শায হতে পারে না। অর্থাৎ একজন ব্যাক্তি কোনো একটি মাসয়ালাতে চার মাযহাবের মধ্যে কোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করলে প্রায় নিশ্চিত থাকতে পারেন যে তিনি স্পষ্ট বিভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ অগ্রণযোগ্য কোনো মতের উপর আমল করছেন না। এটাই চার মাযহাবের ফজীলত যা আহলে হাদীসরা অস্বীকার করার চেষ্টা করে। হানাফী মাযহাবের একজন যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম যদি দলীল প্রমাণের উপর চিন্তা গবেষণা করে ইমাম আবু হানীফার কোনো মতের বিরুদ্ধে যায় তবে তিনি আর হানাফী থাকতে পারেন না

এমন নয়। রুদ্দুল মুহতারে বলা হয়েছে,

إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنيفا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث

যখন কোনো হাদীস সহীহ প্রমানিত হয় এবং সেটা হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে যায় তবে হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে আর এটাই ইমাম আবু হানীফার মাযহাব বলে গণ্য হবে। যারা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন তারা উক্ত হাদীসের উপর আমল করার কারণে হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবেন না। কেননা ইমাম আবু হানীফা হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন "যখন কোনো হাদীস সহীহ প্রমানিত হয় তবে সেটিই আমার মাযহাব"। [রদ্দুল মুহতার]

সুতরাং হানাফী মাযহাব অনুসরণ করা অর্থ কোরআন হাদীস পরিত্যাগ করে ইমাম আবু হানীফার মত মেনে চলা নয় বরং এর অর্থ হলো শত-সহস্র অভিজ্ঞ আলেম ওলামার জ্ঞানের ছায়ায় অবস্থান করে কোরআন হাদীস সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা। অন্যান্য মাযহাবের

ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

### [খ] একাধিক মত ও পথ কেনো থাকবে?

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ (ﷻ) কোরআনের বিভিন্ন স্থানে মতপার্থক্য ও দলাদলী করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে ইসলামের মধ্যে একাধিক মত ও পথ কেনো থাকবে? তাদের কথার উত্তর পূর্বে গত হয়েছে। আমরা দেখেছি কোরআন ও হাদীস বোঝার ব্যাপারে দ্বিমত হতে পারে। সাহাবাদের যুগেও মতপার্থক্য ছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আমরা এ বিষয়ে বহু উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি বনু কুরাইজায় আসরের সলাত পড়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কমাঝে কিরুপ দ্বিমত হয়েছিল এবং রসুলুলাহ (ﷺ) কাউকে তিরষ্কার করেন নি অর্থাৎ তিনি মতপার্থক্যকে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং ইজতিহাদী মাসয়ালাতে তিনটি, চারটি বা তার অধিক মত থাকা আল্লাহ (ﷻ) এর কথার বিপরীত নয় তবে উক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে পরস্পরকে তিরষ্কার করা এবং একজন আরেকজনের সাথে লাঠালাঠি করাই হলো মুলত নিষিদ্ধ দলাদলি। বলা বাহুল্য যে, এই ধরণের দলাদলী

আহলে হাদীসরাই করে থাকে। তারা যে কোনো বিষয়ে কোনোরুপ মতপার্থক্য সহনীয় মনে করে না বিধায় সামান্য মতপার্থক্যের কারণে আলেম-ওলামাদের তিরষ্কার করে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে চার মাযহাবের আলেমরা একটি সীমা পর্যন্ত মতপার্থক্য সহনীয় মনে করে। এমনকি এক মাযহাবের লোকেরা অন্য মাযহাবের লোকদের হক পন্থী বলেই মনে করে। এখন চিন্তা করে দেখার বিষয় হলো এদুটি কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) এর কর্মপন্থার সাথে বেশি সমঞ্জস্যপূর্ণ।

**[গ] হানাফী, শাফেঈ ইত্যাদি নামে পরিচয় দেওয়া।**

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেছেন,

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨]

«তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম।» [সূরা হাজ্জ/৭৮]

সুতরাং মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো নামে পরিচয় দেওয়া যাবে না। একজন মুসলিম কেনো নিজেদের হানাফী, শাফেঈ ইত্যাদি নামে পরিচয় দেবে? নিতান্ত

সাদামাটাভাবে চিন্া করার কারণে এমন সংশয় সৃষ্টি হয়। একজন মুসলিম কি কোনো কারনেই নিজেকে অন্য কোনো নামে পরিচয় দিতে পারবে না? তাহলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আনসার, মুহাজির ইত্যাদি নামে পরিচয় দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো কোনো? এভাবে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের বদরী বলা হয় কোনো? শীয়া, খারেজী, কাদরীয়্যা ইত্যাদি ভ্রান্ মতবাদের বিপক্ষে সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরাম নিজেদের আহলুস সুন্না বা সংক্ষেপে সুন্নী বলে পরিচয় দিয়েছেন কেনো?

একজন ব্যাক্তি যখন বলবে আমি মুসলিম তখন প্রশ্ন করা হবে তুমি খারেজী মুসলিম না শীয়া মুসলিম নাকি কাদীয়ানী মুসলিম? তখন সে কি বলবে? সে কি একটি একটি করে বাতিল ফিরকা সমূহের নাম গুনে গুনে বলবে, আমি খারেজী নই, আমি শীয়া নই, আমি কাদেয়ানী নই .....? এটাই কি বেশি সঠিক নয় যে সে এমন একটি নাম বলবে যাতে মানুষ এই লম্বা কাথাটি সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারে? সে যদি বলে আমি সুন্নী তাহলেই তো বোঝা যায় যে, সে শীয়া বা খারেজী নয়। এই বিষয়গুলোতে আমাদের গভীরভাবে

চিন্া-গবেষণা করতে হবে। একজন ব্যাক্তিকে যদি বলা হয় তুমি কিভাবে সলাত আদায় করো তবে সে সলাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ যা কিছু নিয়ম পদ্ধতি সেগুলো একের পর এক গণনা করার পরিবর্তে যদি বলে আমি হানাফী মাযহাব মতে সলাত পড়ি তবে ক্ষতি কিসে? পরিচয়ের সময় একজন মুসলিম নিজেকে আমেরিকান বা জাপানী বলে পরিচয় দিতে পারলে হানাফী বা শাফেঈ বলে পরিচয় দিতে পারবে না কেনো? মুসলিমদের মধ্যে একাধিক নাম একাধিক পরিচয় থাকা দলাদলি নয় বরং যে কোনো নামের উপর ভিত্তি করে সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সেটা অবৈধ দলাদলি বলে গণ্য হবে। একবার একজন আনসার ও একজন মুহাজির সাহাবী একে অপরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আনসার সাহাবী বলে হে আনসাররা আর মুহাজির সাহাবী বলে হে মুহাজিররা। তাদের ডাকে আনসার ও মুহাজিররা একত্রিত হয় এবং ভীষণ অঘটন ঘটে যাওয়ার মতো অবস্থায় হয় তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বের হয়ে এসে বলেন,

مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

দেখা যাচ্ছে মুহাজির ও আনসারের মতো দুটি পবিত্র নাম যখন মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করা হবে তখন এটাকে জাহেলী ডাক বলা হবে কিন্তু একজন মুসলিম নিজেকে মুহাজির বা আনসার হিসাবে পরিচয় দিলে সেটা সমস্যা নয় কেননা এই ঘটনার আগে বা পরে কখনই মুহাজির ও আনসার পরিচয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অজ্ঞ লোকেরাই কেবল যে কোনো নাম ব্যাবহার করাকে দলাদলি মনে করে। এই বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর আমাদের জানতে হবে যে যারা চার মাযহাবের উপর আপত্তি অভিযোগ উপস্থাপণ করে সাধারন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছাড়াচ্ছেন তারা নিজেদের আহলে হাদীস বা সালাফী বলে পরিচয় দিলেও মূলত তারা কোরআন-হাদীসের সঠিক বুঝ ও সালফে সালেহীনদের পথ হতে বহু দূরে অবস্থান করছেন।

*< সমাপ্ত >*